হাত বাড়ালেই

সুবিধা
Suvida

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৫
অক্টোবর ২০১৩

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

দাম মাত্র দশ টাকা

পুজোর জন্য চারটি গপ্পো !

কথা ও কাহিনি
বাণী বসু, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়,
প্রচেত গুপ্ত, অনুপ ঘোষাল

ডাক্তারের চেম্বার থেকে
বিয়ে সুখের হয় মিলনের গুণে

আমার পুজো
সেলিব্রিটিদের পুজোর কথা

হেঁশেল
বাড়িতে বিজয়ার মিষ্টি !

তুমি মা
পুজোয় চাই সুস্থ শিশু

পোশাকি বাহার
পুজোর সাজ

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

এই সংখ্যা

চিঠিপত্তর	:	৪
শব্দ জব্দ	:	৪
সম্পাদকীয়	:	৫
কথা ও কাহিনি ১	:	৬
হেঁশেল	:	১২
কথা ও কাহিনি ২	:	১৫
কৌতুক	:	১৯
তুমি মা	:	২০
পোশাকি বাহার	:	২২
সেলিব্রিটি সংবাদ	:	২৪
কথা ও কাহিনি ৩	:	২৭
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	:	৩৩
কথা ও কাহিনি ৪	:	৩৮
কবিতা	:	৪১
ভূত ভবিষ্যৎ	:	৪২

সূচিপত্র

৩৩ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
বিয়ে সুখের হয় সঠিক মিলনের গুণে

তুমি মা
২০ পুজোয় চাই সুস্থ শিশু

পোশাকি বাহার
২২ পুজোর সাজ

১২ হেঁশেল
বাড়িতে বিজয়ার মিষ্টি !

চাই ‘মুক্ত’ পুরুষও

‘মুক্ত নারী’ সংখ্যায় বিভিন্ন নারী পুরুষের লেখা পড়ে অনেক কিছুই জানলাম। ‘মুক্ত নারী’ যেমন আমাদের জীবনে আসছে, তেমনই চাই মুক্ত পুরুষ। যে পুরুষের মনে নেই সেই সংস্কার যা বলে নারী পুরুষের অধীনস্থ। যে পুরুষ নারীকে ভোগ্য বস্তু নয়, তারই জীবনের প্রকৃত দোসর মনে করে। এমন পুরুষ যে আছে, তা আমি জানি, কিন্তু সেই পুরুষের সংখ্যা বাড়া দরকার, তবেই আমরা মুক্ত সমাজ হয়ে উঠব। তবেই সমাজে, পথে ঘাটে, মেয়েরা নির্ভয়ে ঘুরতে পারবে।

সুনন্দা ঘোষ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা

অভিভূত হলাম

আপনাদের জুলাই সংখ্যায় প্রীতিকণা পালরায়ের ‘বৃষ্টি মেঘ কুয়াশা ও ভালবাসা’ লেখাটি পড়ে অভিভূত হলাম। বেড়ানোর লেখা এত আকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী অনেকদিন পর পড়লাম। সেই সঙ্গে সেপ্টেম্বর ইস্যুতে সুবোধ সরকারের মুক্ত নারী বিষয়ক লেখাটিও দারুণ লেগেছে। ওর মনোভাব প্রশংসনীয়। রূপক সাহার গল্পও খুবই বাস্তব, আজকের প্রেক্ষিতে। ‘সুবিধা’, আমার মতে সুলভ মূল্যের আকর্ষক পত্রিকা।

অলোক রাহা, দমদম

ঘরের কথা

মেগা সিরিয়াল সংক্রান্ত যে লেখা আপনাদের জুলাই সংখ্যায় বেরিয়েছিল, তা পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। মেগা সিরিয়ালের ‘ঘরের কথা’ উন্মোচিত হল বিভিন্ন চিত্রনাট্যকারদের সাক্ষাৎকারের মাধমে। এক একটি মেগা সিরিয়াল, যা আমাদের টিভির পর্দায় আটকে রাখে, তার আসল নেপথ্য নায়ক নায়িকা কারা সেটা জেনে ভাল লাগল। আমাদের বাস্তব জীবনের ঘরের কথার টুকরো টুকরো আমরা দেখি মেগা ধারাবাহিকের মাধ্যমে। একাত্ম হয়ে উঠি ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে। কখনও ‘বাহা’ তো কখনও ‘রাশি’ হয়ে ওঠে আমাদের জীবনের অঙ্গ। কিন্তু যাঁরা এঁদের তৈরি করেন, রূপ দেন তাঁদের কথা ‘সুবিধা’র পাতায় পড়ে ভাল লাগল। জানতে পারলাম, মেগা সিরিয়ালের ঘরের কথা।

রঞ্জনা গায়েন, হাওড়া

ধন্যবাদ

মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সব লেখা সুবিধায় প্রকাশিত হয় তা খুবই কাজের। ‘তুমি মা’ বা ‘ডাক্তারের চেম্বার থেকে’ বিভাগটি আমাদের জন্য খুবই উপকারি। এই বিভাগে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি যা পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তাই ধন্যবাদ ‘সুবিধা’কে।

সোনালি দে, খড়দহ

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

শব্দজব্দ ১৭ দশপ্রহরণধারিণীকে নিয়ে শ্যামদুলাল কুণ্ডু

১		২		■	৩	■	৪
■	■		■	■	৫		
৬	■	৭		৮		■	
৯			■		■	■	
	■	■	১০	■	১১		
	■	১২				■	
১৩			■	■		■	■
	■		■	১৪			

পাশাপাশি

১। দেবী দুর্গাকে ইন্দ্র বজ্র ছাড়া যে বাহন দিয়েছিলেন। ৫। চন্ডিকাদেবীর এক রূপ, কালী। ৭। দেবীকে বরুণের দেয় অস্ত্র। ৯। চন্দ্রবংশীয় এক রাজা যিনি সর্বপ্রথম দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা আরাধনা করেন। ১১। দুর্গার দশমহাবিদ্যার এক রূপ। ১২। দেবীর পূজায় যা একশো আটটি লাগে। ১৩। শ্রী রাধিকার এক সখি, দুর্গার এক নাম। ১৪। বিষ্ণু দশভূজাকে দিয়েছিলেন যে চক্র।

উপরনিচ

২। মহাদেবের মূর্তি সমন্বিত এক পর্বতশৃঙ্গ, এক তীর্থ। ৩। ‘—ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ।’ ৪। ‘আজি মেঘ কেটে গেছে—,/ এসো হাসিমুখ’। ৬। অসুর বিনাশিনী দশপ্ররণধারিণী। ৮। নয়টি গাছের নয়টি যা দিয়ে নবপত্রিকা রচিত হয়। ১০। আমার রাত পোহাল শারদ—এ’। ১১। বলদৈত্যকে যিনি ভেদন করেছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্র। ১২। একশো চক্ষু বিশিষ্টা, দুর্গার নামান্তর

সমাধান শব্দজব্দ ১৬

ঐ	রা	ব	ত	■	আ	■	স
■	■	দ্রী	■	■	কা	লি	কা
অ	■	না	গ	পা	শ	■	ল
সু	র	থ	■	তা	■	■	বে
র	■	■	প্রা	■	ব	গ	লা
দ	■	শ	ত	দ	ল	■	য়
ল	লি	তা	■	■	ভি	■	■
নী	■	ক্ষী	■	সু	দ	র্শ	না

Suvida বর্ষ ৩ সংখ্যা ৫

দুর্গাপুজো এসে গেল। প্রতি বছরের মতো এবারও আছে পুজোর আনন্দ, উন্মাদনা। আছে ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম ও শান্তির মিশ্র অনুভূতি। মা দুর্গার এই অকালবোধন বাঙালির সেরা উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে যেমন থাকে মানুষের উত্তেজনা, তেমনই সর্বক্ষেত্রে, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়ে ষোলোআনা। পুজোকে কেন্দ্র করে কেনাকাটার হিড়িক তো পড়েই। সেই সঙ্গে পুজোর মিষ্টি, পুজোর রান্না, পুজোর বই, পুজোর গান, পুজোর সিনেমা, পুজোর সাজগোজ, পুজোর প্রেম, পুজোর খাওয়া, বেড়ানো সবই থাকে।

দুর্গাপুজোর আনন্দের সবচেয়ে বড় অংশ নিহিত থাকে পুজোর আগাম প্রস্তুতিতে। অনেকটা আমাদের সিনেমা বানানোর মতো। প্রথমেই ভাবনা স্তর : এবার পুজো কেমন হবে? ট্র্যাডিশনাল না থিম পুজো! যেটাই ঠিক হোক না কেন, তার জন্য প্রস্তুতি। কী লাগবে, কাকে লাগবে, কত লাগবে। সিনেমার প্রি প্রোডাকশন-এর মতো। কাস্টিং, স্ক্রিপ্ট ও বাজেট তৈরি। তারপর শুরু প্যান্ডেল বানানো। সাজানো, মূর্তি আনা... অনেকটা আমাদের শ্যুটিং-এর মতোই। শেষে গিয়ে পোস্ট প্রোডাকশন, অর্থাৎ কী মিউজিক বাজবে, কীভাবে জনগণ ঢুকবে বেরবে, কী কী আনুষঙ্গিক স্টল ও পারফর্ম্যান্স হবে ইত্যাদি। অবশেষে চারদিনের পুজো, ষষ্ঠিতে যার রিলিজ আর দশমী বা একাদশীতে শেষ। সিনেমাও এখন আর দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে না। এখন যেমন পুজোর সংখ্যা অনেক এবং প্রতিবছরই বাড়ছে, তেমনই সিনেমার রিলিজ-এও কতগুলো প্রিন্ট হচ্ছে, তা বাড়ছে। ফলে ছবি চলার হলে, বাণিজ্য সফল হতে প্রথম এক সপ্তাহেই টাকা উঠে যায়। এক থেকে বড়জোর দুই কি তিন সপ্তাহ ছবি চলে। অবশ্য ছোট বাজেটের ছবির ক্ষেত্রে সিনেমাটি কয়েকটি হল-এ অন্তত পাঁচ ছয় এমনকি দশ বারো সপ্তাহও চলে। যেমন পুজোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্যান্ডেলে ঠাকুর লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন পর্যন্তও রেখে দেওয়া হয়।

এবার পুজোয় সুবিধার পাঠকদের জন্য কিছু বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে আমাদের পাতায়। চার চারটি গল্প লিখেছেন, বাণী বসু, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত ও অনুপ ঘোষাল। এছাড়াও রয়েছে পুজোর জন্য মিষ্টি মুখের হদিশ, ফ্যাশন, কিছু বিশিষ্ট মানুষের পুজোর পর্যালোচনা। পুজোর মধ্যে আশাকরি অল্পবিস্তর সময় করে একবার সুবিধায় চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন আপনারা। অনেক শুভেচ্ছা জানাই সকলকে, পুজো ভাল কাটুক, শান্তি আসুক আমাদের জীবনে!

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

সুবিধা এখন মাসিক হল। বছরে ১২টি সংখ্যা!
আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট একশো টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

১২টি সংখ্যা মাত্র ১০০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম ....বয়স.........................

ঠিকানা ....

কী করেন ....দূরভাষ................................

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

উৎসব সংখ্যা

হানিমুন

প্র চে ত গু প্ত

কথা ও কাহিনি -১

গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ইতি সামান্য হোঁচট খেল। গাড়ির পাদানি মাটি থেকে অনেকটা ওপরে। দামি গাড়ির এই এক সমস্যা। মাটির ওপর দিয়ে ছুটলেও মাটি থেকে উঁচুতে থাকে। সম্ভবত নাক উঁচু ভাব তৈরির জন্যই এইভাবে বানানো হয়। নিজেকে সামলে ইতি গাড়ি থেকে নামল এবং থমকে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়ানোর কারণ দুটো। মজার ব্যাপার হল, দুটো কারণ পরস্পর বিরোধী। একেবারে উল্টো। অথচ রিঅ্যাকশন একই রকম। এরকমটা সচরাচর ঘটে না। ইতি একই সঙ্গে মুগ্ধ হয়েছে এবং অস্বস্তিতে পড়েছে। মুগ্ধ হওয়ার কারণ স্পষ্ট হলেও, অস্বস্তির কারণ ঝাপসা। কেমন একটা ভয় ভয় করছে! সেই ভয়টাও চেনা ভয় নয়, অচেনা ভয়।

প্রথমে মুগ্ধ হওয়ার কথাটা বলা যাক।

এতো সুন্দর জায়গা ইতি আগে কখনও দেখেনি। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর জায়গা আছে যেখানে নিজে যাওয়া হয় না। বইয়ের ছবিতে বা সিনেমা-টিভিতে দেখা যায়। সম্ভবত এই কারণে কোনও জায়গা সুন্দর লাগলে বলা হয়, 'ছবির মতো

লাগছে।' কথাটা ইতির পছন্দ নয়। ছবির মতো সুন্দর মানে কী? নিজের চোখে দেখা সুন্দরের থেকে ছবির মতো সুন্দর কি বেশি ভাল? মোটেই না। তাছাড়া ছবির সুন্দরে খুঁত থাকে না। খুঁত ছাড়া সৌন্দর্য হয় না। সত্যিকারের যে জিনিস সুন্দর তাতে কিছু খুঁত থাকবেই। খুঁত নিয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। যদিও এখন এই সব গুরুগম্ভীর কথা ভেবে লাভ নেই। এই জায়গা ইতি ছবির সঙ্গে তুলনা করতে পারছে না। তার ইচ্ছে করছে, খুশিতে একটা লাফ দিতে। বড় লাফ নয়, ছোটোখাটো একটা লাফ। চব্বিশ বছর তিনমাস বয়েসের কোনও মেয়ে একটা জায়গা দেখে যদি খুশি হয় তাহলে কি সে ছোটো একটা লাফ দিতে পারে? অবশ্যই পারে। সমস্যা তো কিছু নেই। কিন্তু ইতি কি পারবে?

না, পারবে না। ইতি এসেছে হানিমুনে। হানিমুনে আসা কোনও মেয়ের পক্ষে লাফালাফি করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। স্বামী আগে থেকে চেনা হলে তাও একটা কথা। বিয়ে যদি প্রেম করে হত তাহলে স্বামীর হাত ধরেও লাফ দেওয়া যেত।

'উফ্ কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

'আরে! কী করছো? আমাকে ছাড়বে তো...ইতি পড়ে যাবে...ইতি...।'

'কিচ্ছু পড়বে না, তোমাকে ধরে আছি।'

'তাবলে লাফাবে?'

'আলবাত লাফাবো। তুমিও লাফাবে। মনে হচ্ছে, প্রকৃতি জায়গাটা আমাদের জন্য বানিয়ে রেখেছে। আমাদের হানিমুনের জন্য। তাই না? অ্যাই আমাকে একটা চুমু খাও। প্লিজ খাও... উ উ...প্লিজ খাও...প্লিজ...।'

'তোমার মাথাটা একদম গেছে ইতি। এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমাকে চুমু খাব। লোকে কী ভাববে?'

'খাবে না তো? তাহলে কিন্তু আমি তোমার গলা জড়িয়ে চুমু খাব।'

না, এসব সম্ভব নয়। ইতি দেবাদিত্যকে চিনত না। তাদের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছে। দেখাশোনার বিয়ে হলেও আজকাল বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের একান্তে পরিচয় হয়। একধরনের প্রেম প্রেম ব্যাপার। বাবা-মা, বড়মামা, মেজোমাসি, ছোটোকাকা, রাঙাবউদি পাত্র ফাইনাল করলেও বাড়ির মেয়েকে হালকা প্রেম অ্যালাও করা হচ্ছে। একে বলে 'অনুমতি প্রেম'। 'অনুমতি প্রেম'-এর সময় মেয়ে বাড়ির পারমিশন নিয়ে হবু বরের সঙ্গে রেস্তোরাঁ, শপিংমল, গঙ্গার ঘাটে ঘোরাঘুরি করতে পারে। টেলিফোনে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে। গা ঘেঁষাঘেষি করে বসতে পারে। মেয়ের বাবা অবশ্য প্রথমটায় আপত্তি করে।

'এসব আবার কী! বিয়ের আগে ছেলের সঙ্গে ঘুরবে! ছি ছি। তোমরা রাজি হয়ে গেলে!'

মেয়ের মা বলে, 'এতে ছি ছি'র কী আছে? বিয়ের আগে ছেলেমেয়েতে চেনাজানা হলে ভাল। দু'দিন একসঙ্গে ঘুরুক, কথা টথা বলুক।'

মেয়ের বাবা চোখ কপালে তুলে বলে, 'চেনাজানা হয়ে কী লাভ? দু'দিনে মানুষ চেনা যায়? তাছাড়া তোমার মেয়ে তো একটা গাধা। গাধা মেয়ে যে মানুষ ভুল চিনবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? হয়তো ভালকে মন্দ ভাববে, অথবা অতি বদ ছেলের জন্য গদগদ্ হয়ে পড়বে। গাধারা সব পারে।'

মেয়ের মাও তেড়েফুড়ে বলে, 'আমার মেয়ে গাধা! সে এম এ পাশ করেছে। তাকে তুমি গাধা বলছো?'

অবশ্যই গাধা বলছি এম এ পাশ করা গাধা আমি অনেক দেখেছি। আমাদের সময় চিন্ময় পলিটিকাল সায়েন্সে এম.এ তে ফার্স্টক্লাস পেল। তাকে আমরা ডাকতাম গাধা চিনু। তার কারণ চিনু জগতের আর কিছুই বুঝত না, শুধু পড়ত। গাধা যেমন জানে জীবনের সব রস রয়েছে পিঠের বোঝায়, চিনু তেমন জানত জীবনের রস আছে লেখাপড়ার বইতে। গাধাটা জানত না, শুধু লেখাপড়ায় কিস্যু হয় না। লাইন ধরতে হয়। লাইন ছাড়া ভাল রেজাল্ট, নুন ছাড়া রান্নার মতো। কেউ মুখে তোলে না। লাইন করতে পারেনি বলে চিনু গাধা না পেরেছে বিদেশে যেতে, না পেরেছে এখানে ঠিকমতো কেরিয়ার করতে। সুন্দরবনের জঙ্গলে কলেজে পড়ায়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার জানলার বাইরে বসে ওর লেকচার শোনে।'

মেয়ের মা এতে আরও রেগে যায়। বলে, 'সুন্দরবনের কলেজ কী কলেজ নয়? সেখানে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না? পড়াতে গেলে মাস্টারদের যোগ্যতা লাগে না? চুপ করো। কার সঙ্গে ঘর সংসার করবে মেয়েদের আগে থেকে জানা উচিত।'

মেয়ের বাবা বলে, 'কই তোমার তো লাগেনি! আমার মা, কাকিমা, ঠাকুমারও লাগেনি। তারা দিব্যি সংসার করেছে। আমার মেয়ের কেন লাগবে? সে কোন রাজকন্যা?'

মেয়ের মা এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'তোমার মা ঠাকুমার কী হয়েছে জানি না, তবে আমার জানা উচিত ছিল। না জেনে মারাত্মক ভুল করেছি।'

'কী জানা উচিত ছিল?'

মেয়ের মা রাগে ফোঁস করে। মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আমি যদি বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে মিশতাম তাহলে জানতাম আমি জলে পড়তে চলেছি।'

মেয়ের বাবা বলে, 'জেনে কী লাভ হত? জানা জলেও মানুষ ডোবে, অজানা জলেও মানুষ ডোবে। এমন তো নয় যে জানা হলে জল তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে।'

এইভাবে ঝগড়া খানিকক্ষণ চলার পর একটা পর্যায়ে এসে মেয়ের মা গলা নামায়। বলে, 'ছেলেই তো চাইছে। মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইছে। আরে বাবা, এসব হল গিয়ে এখনকার স্টেটাস। ছেলে বড় অফিসে কাজ করে, মোটা মাইনে পায়, গাড়ি চালায়, ক্লাবে যায়। শুধু বাপ-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করলে প্রেস্টিজ থাকে? বন্ধুদের কী বলবে? সঙ্গে একটু ইয়ে লাগে। তুমি আর একদম ট্যাঁক ট্যাঁক কোরও না। এসব তুমি বুঝবে না। মনে রেখো বেশি আপত্তি করলেই গাঁইয়া ভেবে পিছিয়ে যেতে পারে। আজকাল ছেলেরা সব পছন্দ করে, ব্যাকডেটেড শ্বশুর-শাশুড়ি পছন্দ করে না।'

ব্যস, এতেই কাজ দেয়। 'সুপাত্র' পিছিয়ে যেতে পারে শুনে মেয়ের বাবা চুপসে যায়। গলা খাকাড়ি দিয়ে, মাথা নামিয়ে বলে, 'একথা আগে বলবে তো। তুমি বরং আজই মিনুকে যেতে বল। তবে বেশি নয়, যতই হোক মেয়ে বলে কথা।'

মেয়ের বাবা 'বেশি নয়' বললেও ছেলের যদি বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো থাকে, তাহলে পাত্রীকে নিয়ে সে সিনেমা হলে পর্যন্ত যেতে পারে। সিনেমা কেমন লাগল জানবার জন্য পাত্রীর পিসতুতো, মাসতুতো,

খুড়তুতো বোনেরা পরদিন দুপুরে বাড়ি চলে আসে। পাত্রী লজ্জা পায়। শেষ পর্যন্ত বোনেরা দরজা বন্ধ করে সিনেমার গল্প বলতে বসে। সিনেমা ছিল ভয়ের, তবু দরজার বাইরে থেকে 'হি হি', 'হা হা', 'হো হো' শোনা যায়। এতে অবাক হওয়ার কথা! ভয়ের সিনেমার গল্প শুনতে শুনতে এত হাসি কীসের! মেয়ের মা অবাক হয় না, নিশ্চিত হয়। চোখ বুজে কপালে হাত ঠেকায়। বিড়বিড় করে বলে, 'ঠাকুর, ঠাকুর।' নারী শুধু আলোয় সুন্দর হলে হয় না, অন্ধকারেও তাকে সুন্দর হতে হয়। যাক, হবু জামাইয়ের তাহলে মেয়েকে অন্ধকারেও পছন্দ হয়েছে। ঠাকুর, ঠাকুর।

ইতির এসব সুযোগ ছিল না। তার বিয়ের কথাবার্তা শুরু থেকে শেষের মাঝখানে মাত্র বাইশদিনের ফারাক ছিল। এই সামান্য ফারাকে পাত্রপাত্রীর আলাদা আলাপ অসম্ভব। অবশ্য বেশি ফারাক থাকলেও লাভ হত না। দেবাদিত্য প্রাক বিবাহ প্রেম করা ধরনের পাত্র নয়। একেবারে অন্যরকম। তার ওপর ইতির থেকে সে পাক্কা আট বছর তিন মাসের বড়। ভারিক্কি চেহারা, গম্ভীর, মাথার পিছনে অল্প টাক। চব্বিশ বছরের এক সুন্দরী মেয়ে আট বছরের বড় গম্ভীর টাকঅলা পাত্রকে বিয়ে করবে কেন?

সম্বন্ধ এসেছে দুম করে। ইতির খুড়তুতো মাসি একদিন সাত সকালে নাকতলা থেকে এসে হাজির। চোখমুখে উত্তেজনা আর গর্ব। যেন ভ্যানিটি ব্যাগে করে চাঁদ নিয়ে এসেছে। চা খাওয়ার পর বের করবে।

'ভাল করে শোনো, ছেলে প্রবাসী। পাটনায় বড় চাকরি করে। অফিসের গাড়ি, অফিসের বাড়ি। মনে রাখবে অফিসের গাড়ি, অফিসের বাড়ি নিজের বাড়ি-গাড়ির থেকে অনেক বড় ব্যাপার। তার ওপর বাড়ি আবার তোমার বাড়ির মতো নরমাল বাড়ি নয়। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, সামনে লন। লনে গার্ডেন চেয়ার। বেয়ারা সেখানে চা দিয়ে যায়। সব থেকে নিশ্চিন্তের কথা ছেলের বুড়ো বাপ-মা থাকে কলকাতায়। বছরে একবার করে শীতে ছেলের কাছে আসে। তাও গত বছর অতিরিক্ত শীতের কারণে ড্রপ গেছে। এ বছর শীত বাড়লে একই কাণ্ড ঘটবে। বুঝতেই পারছ এই বিয়ে হলে ইতি হবে সংসারে সর্বেসর্বা।'

ইতির মা কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'তা বলে বয়েসে এতটা তফাৎ?'

খুড়তুতো মাসি রেগে গিয়ে বলে, 'বয়েসে তফাৎ তোর কী সমস্যা? বয়স ধুয়ে কি তোর মেয়ে জল খাবে? তাহলে তুই বরং এক কাজ কর, বয়েসে কম ফারাক দেখে কারও সঙ্গে বিয়ে দে। তোর জামাই টিফিন নিয়ে ট্রামে করে অফিস যাক। মাসের শেষে ইতি এসে তোর কাছে টাকা ধার করুক। শাশুড়ি আর ননদের টিকিস টিকিস শুনুক। ইতি কী এমন চাঁদের টুকরো মেয়ে বাবা যে কম বয়সের রাজকুমার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে? নিজের ছেলেমেয়ের সম্পর্কে আন্ডার এস্টিমেট করা যেমন খারাপ, ওভার এস্টিমেট করাও খারাপ। আমি বরং এদের না বলে দিই।'

ইতির বাবা বুদ্ধিমান। বুদ্ধির থেকেও বেশি সংসারী। তিনি হাত তুলে শালীকে থামান।

'আহা, এখনই না বলবে কেন? কথাবার্তা খানিকটা এগোক। আমরাও একটু খোঁজখবর নিই।'

ইতির খুড়তুতো মাসি এতে আরও অপমানিত হয়। বলে, 'আপনাদের আলাদা করে খোঁজ খবর নেবার কী আছে জামাইবাবু? আমি কি কিছু লুকোচ্ছি? যেমন যা জেনেছি, সবটাই আগেভাগে বলে রাখছি। এই যেমন বলছি, ছেলের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল।'

ইতির মা আঁতকে উঠল, 'আগে বিয়ে!'

মাসি বলল, 'আঁতকে উঠলি যে বড়! মানুষের আগে বিয়ে হয় না? নাকি এই প্রথম শুনলি? পুরুষ মানুষের আগে একটা কেন, দশটা বিয়ে হলেই বা ক্ষতি কীসের!'

ইতির বাবাও থমকে গেল। বলল, 'তা বলে, বিয়ে হওয়া ছেলের হাতে কি মেয়েকে তুলে দেওয়া ঠিক হবে?'

খুড়তুতো মাসি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক হবে না জামাইবাবু। আপনি বরং অন্য ছেলে দেখুন। প্রথম বিয়ে করছে, এমন ছেলে। ছেলের সঙ্গে প্রথম শ্বশুর, প্রথম শাশুড়ি, প্রথম আইবুড়ো ননদ সব খুঁজে নিন। মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়িতে উঠতে বসতে ঝাঁটা লাথি খাবে, তখম বলবেন, আহা, তাতে কী হয়েছে, এ তো প্রথম লাথি ঝাঁটা। আপনাদের যখন প্রথমের জন্য এত টান তাই হোক।'

মাসির এই যুক্তিতে মেয়ের মা-বাবা দুজনেই যেন মনে বল ভরসা পেল। সত্যি তো, বয়স বেশি ইমপর্টান্ট না মাইনে বেশি ইমপর্টান্ট? ছেলের আগে বিয়ে বেশি ইমপর্টান্ট না মেয়ের একার সংসার বেশি ইমপর্টান্ট। আইবুড়ো ননদ ভাল না বাড়ির সামনে লন ভাল? রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলা ভাল না লনের গার্ডেন চেয়ারে বসে চা খাওয়া ভাল?

সহজ হিসেব দাঁড়িপাল্লা এই পাত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

ইতির মা আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁরে, ওই ছেলের তোর ইতিকে পছন্দ হবে তো?'

মাসি ঠোঁট উলটে বলল, 'না হলে না হবে। আমরা কি ওর পায়ে ধরে বলছি, ওগো, তুমি আমাদের মেয়েকে বিয়ে না করলে আমাদের মেয়ের কোনওদিন বিয়ে হবে না? না হয় আমাদের মেয়ে দেখতে শুনতে তেমন নয়, না হয় গায়ের রঙ ময়লা, না হয় বাবার তেমন রোজগার নেই, না হয় মফঃস্বলে দু' কামরার ঘুপচি ফ্ল্যাটে থাকে, তা বলে তার বিয়ে হবে না এমন তো নয়! না হয় ছেলেও সেরকম হবে। হাবাগোবা, কমরোজগেরে। বিয়ে তো হবে। আমি খবর পেলাম, বউ মারা যাবার পর থেকে ছেলে নাকি আর একটা বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

ইতির বাবা এবার আঁতকে উঠল। চোখ কপালে তুলে বলল, 'মারা গেছে! সেকী, মারা গেছে কেন?'

ইতির খুড়তুতো মাসি বলল, 'কী হল জামাইবাবু? চমকে উঠলেন মনে হচ্ছে। মানুষ মারা যায় না? এই প্রথম শুনছেন?'

ইতির মা আমতা আমতা করে বলল, 'না, আমি ভেবেছিলাম ডিভোর্স।'

খুড়তুতো মাসি বিদ্রূপের হেসে বলল, 'কেন? মৃত্যুর বদলে ডিভোর্স হলে ইতির কী সুবিধে হত? মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসত? জেনে আসত কীভাবে সেই মেয়ে সংসার সামলাতো?'

ইতির বাবা থতমত খেয়ে বলল, 'না, না তা নয়... আসলে... মৃত্যু টিত্যু শুনলে কেমন একটা লাগে। তাই না?'

মাসি এবার ধমক দেওয়ার গলায় বলল, 'ওসব আসল নকল বাদ দিন জামাইবাবু। খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন। এসব হীরে মুক্তো বাজারে পড়ে থাকে না। সুন্দরী মেয়েদের বাবা-মায়েরা জাল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলের মামিমা নেহাত আমার চেনাজানা, আমাকে ভরসা করে, তাই ভাল মেয়ের খোঁজ দিতে বলেছে।'

ইতির মা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁগো, ওদের কি মেয়ে পছন্দ হবে?'

খুড়তুতো মাসি খুড়তুতো টাইপ হেসে বলল, 'বললাম তো না হলে বয়ে গেল। তবে একটা কাজ তোমাদের না বলেই আগে করে রেখেছি। ইতির একটা কালার ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ছেলে নাকি একবার দেখেই হ্যাঁ বলেছে।'

ইতির বাবা খুশি হয়ে একগাল হেসে বলল, 'তাই নাকি!'

মাসি ভুরু তুলে বলল, 'এবার তাহলে বুঝুন জামাইবাবু, এই ছেলের জন্য কেন চাপাচাপি করছি। খুব কম পুরুষমানুষই মেয়েদের ফর্সা রঙ, হবু শ্বশুরমশাইয়ের ব্যাঙ্ক ব্যালন্স দেখে না। গায়ের রঙ নয়, মেয়ের মন ফর্সা হলেই তারা খুশি হয়। দেবাদিত্য সেই রকম পুরুষের একজন।'

ইতির মা অবাক হয়ে বলল, 'দেবাদিত্য! সে আবার কে!'

মাসি গম্ভীর গলায় বলে, 'তোর জামাই। তাহলে ডেট ফাইনাল করতে বলি? ছেলের হাতে সময় কিন্তু খুব কম। বউ হারিয়ে বেচারির সংসার একেবারে ছেড়াবেড়া হয়ে আছে। মাঝনদীতে গিয়ে ইতিকে হাল ধরতে হবে। তবে চিন্তা করিস না, বড় চাকরি, বাড়িতে চার পাঁচজন বেয়ারা বাবুর্চি থাকবে।'

ইতির মা নিচু গলায় বলল, 'একবার ইতির সঙ্গে কথা বলা উচিত না?'

ইতির বাবা দিল ধমক, 'রাখো তোমার কথা। সে কী বলবে? সে নিজের ভাল মন্দর কী বোঝে? এরকম ছেলে সে মাথা কুটলেও পাবে না। বয়স বেশি তো কী হয়েছে? স্বামী বয়েসে বড় হওয়াই মঙ্গল। শাসন থাকে। মনে রাখবে সংসার সুখের হয় শাসনের গুণে।'

ইতির মা বলল, 'না, আগে তো একটা বিয়ে ছিল, মেয়ের যদি তাতে কোনও আপত্তি থাকে।'

ইতির বাবা উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, 'আপত্তি থাকলে থাকবে। আপত্তি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। যে ছেলে আগে বিয়ে করেছে, স্ত্রী সম্পর্কে ধ্যান ধারনা অভিজ্ঞতা থাকে। আর এ তো কোনও ঝগড়াঝাঁটির ছাড়াছাড়ি নয়, বেচারি মারা গেছে।'

কথা শেষ করবার জন্য ইতির বাবা গলা ভারি করে ফেলে। খুড়তুতো মাসি বোনের গায়ে হাত রেখে বলে, 'চিন্তা করিস না। তোর মেয়ের ভাগ্য ভাল। নইলে এমন ছেলে কপালে জুটত না। দেবাদিত্যর মামিমাকে আজই খবর দিচ্ছি। ওরা এসে মেয়ে দেখে যাক।'

'ওরা' এল না। পাটনা থেকে পাত্র এল একা। খুব খুশি হল ইতির বাবা। একেই বলে পুরুষমানুষ। মেয়ে দেখার নাম করে মামা, কাকা, বন্ধুরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে যাওয়ার মতো অশ্লীল জিনিস না। এই ছেলে সেরকম নয়। সবাই মিলে মেয়ে দেখবার কী আছে? এটা কি পুজোর বাজার? সবাই মিলে শাড়ির খোল, জমি, পাড়ে হাত ঘষে দেখবে? নিজের বিয়ের সময় এই জিনিস সে মোটেও অ্যালাও করেনি। ল্যাগব্যাগে টাইপের এক বন্ধুকে নিয়ে ইতির মাকে দেখতে গিয়েছিল।

ইতি আর তার মা কিন্তু দুঃখই পেল। এ কেমন মেয়ে দেখা! সঙ্গে বড় কেউ একজন আসবে না। বাবা-মা? নিদেন পক্ষে মামীমাকেও তো আনতে পারত। খুড়তুতো মাসি বলল, 'বাবা-মাকে আনবার প্রশ্নই ওঠে না। ছেলে এসবে বিশ্বাস করে না। বিয়ে করবে সে, বাবা-মা নয়। ঘরে দাসীও নিয়ে যাচ্ছে না যে অন্যদের পছন্দ করতে হবে। মামীমাকেও এবার বাদ দিয়েছে। আগেরবারের ঘটনায় সে আপসেট। সেরকমটি আর করতে চায় না। এবার নিজের পছন্দই তার কাছে ফাইনাল।'

দেবাদিত্য কম কথা বলে। বেশিরভাগ সময়ই মাথা নামিয়ে বসে রইল। ইতির বাবা বললে, অল্প কথায় উত্তর দিল। সেই সব কথার বেশিরভাগই পাটনা শহর সম্পর্কে কথা। সেখানকার আবহাওয়া, গাড়িঘোড়া, লোকজন, দোকানবাজার এইসব। ইতি চা-খাবার নিয়ে ঘরে আসতে মুখ তুলল। খাবার সরিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি ওর সঙ্গে দু মিনিট একা কথা বলি আপনাদের আপত্তি আছে?'

অন্য সময় হলে এই প্রস্তাব যথেষ্ট আপত্তিকর এবং অদ্ভুত মনে হত। এ আবার কী কথা রে বাবা! মেয়ে দেখতে এসে পাত্র ঘর থেকে সবাইকে চলে যেতে বলে নাকি? কিন্তু এই পাত্রের বেলায় গোড়া থেকেই ঘটনা ঘটছে অদ্ভুত। অদ্ভুত হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক। তাই এটাও সবাই মেনে নিল। ইতি বেতের সোফায় একা বসে রইল কাঠ হয়ে। মাথা নিচু করে নাড়াচাড়া করতে লাগল শাড়ির আঁচল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেবাদিত্য বলল, 'ভাল আছেন?'

মাথা নামানো অবস্থাতেই ইতি ঘাড় কাত করল। দেবাদিত্য একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আপনি কি জানেন, আমি আগে একটা বিয়ে করেছিলাম?'

ইতি চমকে উঠল। চুপ করে থাকল। দেবাদিত্য একটু অপেক্ষা করে অধৈর্য গলায় বলল, 'সেকী! আপনি জানেন না? আপনার মাসি কিছু বলেনি?'

ইতি তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, জানি।'

দেবাদিত্য খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দিল। একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'আপনি কি জানেন, আমার সেই স্ত্রী মারা গেছে?'

ইতির অস্বস্তি বাড়ল। মেয়ে দেখতে এসে এসব কেমন প্রশ্ন! কোথায় লেখাপড়া, গান, শখ আহ্লাদ নিয়ে কথা হবে, তা না মরা বউ নিয়ে ইন্টারভিউ! ইতি ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলে নামিয়ে নিল। তার মধ্যেই দেখে নিল, সামনে বসা মানুষটার ভুরু কুঁচকে আছে। ইতি চাপা গলায় বলল, 'জানি। মাসি বলেছে।'

দেবাদিত্য হাতে রাখা চায়ের কাপের দিকে তাকিয়েই বলল, 'আমি বিষয়টা গোপন রাখতে চাই না। পরে যেন মনে না হয়, কোনও ভুল হয়ে গেল।'

ইতির এবার হালকা ভাল লাগছে। মানুষটার কথা অস্বস্তিকর হলেও খাঁটি। দেবাদিত্য শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আমার শেষ প্রশ্ন করি?'

ইতি ফিসফিস করে বলল, 'বলুন।'

'আপনি কি এসব জেনেও আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন?'

ইতির বুকটা ধক করে উঠল। ভয়ে না, লজ্জায়। মুখ ফুটে একথার সে কী উত্তর দেবে? সে তো এই যুগের শহুরে, অতি আধুনিক মেয়েদের মতো নয়। লেখাপড়া শিখলেও এখনও ভিতরে ভিতরে অনেক বাধা। পুরনো কালের মেয়েলি বাধা।

দেবাদিত্য নিচু গলায় মাথা নামিয়ে হাতের কাপটাকে নাড়তে নাড়তে বলল, 'আজ আমি এসেছি শুধু এই কারণে। আপনার মুখ থেকে সম্মতির কথা শুনতে। আমি চাই না, ভবিষ্যতে এই নিয়ে কোনও রকম ভুল বোঝাবুঝি থাকুক। যদি আপত্তি থাকে স্পষ্ট বলুন। কেউ জানবে না। আমি সবাইকে অন্য কথা বলব। বলব... বলব আমার পছন্দ হয়নি।'

মন ভরে গেল ইতির। এমন চমৎকার মানুষ! একটু চুপ করে রইল ইতি। তারপর আলগোছে দু পাশে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আপত্তি নেই।'

দেবাদিত্য বলল, 'ভেবে বলছেন?'

ইতির ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, এই পুরুষমানুষটি যদি তার থেকে কুড়ি বছরেরও বড় হয় তাহলেও একেই সে বিয়ে করবে। বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ।'

দুজনেই চুপ করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। দেবাদিত্য বলল, 'আপনি কি আমাকে কোনও প্রশ্ন করতে চান?

লজ্জায় লাল হয়ে ইতি দু পাশে মাথা নাড়ল।

দেবাদিত্য একটু সোজা হয়ে বসে বলল, ‘আপনি কি জানেন, আমি আগে একটা বিয়ে করেছিলাম?’
ইতি চমকে উঠল। চুপ করে থাকল। দেবাদিত্য একটু অপেক্ষা করে অধৈর্য গলায় বলল, ‘সেকী! আপনি জানেন না? আপনার মাসি কিছু বলেনি?’

‘আমার আগের স্ত্রীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা আছে?’

ইতি মাথা নামিয়ে নিল।

দেবাদিত্য বলল, ‘তার মৃত্যু নিয়ে কোনও প্রশ্ন?’

ইতির এবার রাগ হল। যে নেই তাকে নিয়ে এত বকবক করার কী আছে? আমি তো আছি। আমাকে নিয়ে করো না বাপু। সে জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

আয়োজন হল ঝড়ের বেগে। ছেলের হাতে সময় কম। পাটনায় ফিরে অফিসে জয়েন করতে হবে। দ্বিতীয় বিয়ে বলে কোনও আড়ম্বরেও রাজি নয় দেবাদিত্য। তবে মেয়ের বাড়ি কিছু করলে আপত্তি নেই। ইতির বাবা জোর করেনি। এত কম খরচে মেয়ের বিয়ে হবে কল্পনার মধ্যেও ছিল না. ইতির মা একটু গাঁইগুই করল।

‘ওর দ্বিতীয় বিয়ে, আমার মেয়ের তো প্রথম। তারও তো শখ আহ্লাদ আছে। সেও তো চায় তার বিয়েতে হই চই হোক।’

ইতি তার মাকে অবাক করে দিয়ে বলল, ‘থাক, ওই মানুষটার কথাও তো বুঝতে হবে। হয়তো কোনও সেন্টিমেন্ট রয়েছে। তাকে খোঁচা দেওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না।’

খুড়তুতো মাসি মুখ টিপে হেসে বলল, ‘বাবা বিয়ের আগেই এত দরদ!’

ইতি ধাক্কা দিয়ে বলল, ‘যাঃ মাসি, তুমি না...।’

পরদিন ভোরবেলা বর বউ যখন কলকাতা এয়ারপোর্টের জন্য রওনা হল তখন সবাই জানত বউ চলল পাটনা, শ্বশুরবাড়ি। এয়ারপোর্টে ঢুকে ইতি জানল, না পাটনা নয়। তারা যাচ্ছে বাগডোগরা। হানিমুনে। পরিকল্পনা দেবাদিত্যর। ইতিকে সারপ্রাইজ দেবে বলে জানায়নি। মনে মনে খুব খুশি হল ইতি। তবে মুখে কিছু বলল না। একেই বলে কম কথা বলা ভারিক্কি মানুষটাকে কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তার ওপর বিয়ের দিন থেকে আরও একটু যেন বেশি থম মেরে গেছে। তবে বাগডোগরায় নেমে কোনও সমস্যা হল না। দেবাদিত্য চুপচাপই সব ব্যবস্থা করে ফেলল...। গাড়ি নিয়ে পাহাড়, চা-বাগান আর পাইনের জঙ্গল টপকে উঠে এল এই চমৎকার উপত্যকায়। হানিমুনে। নেশা ধরানো পাহাড়ি বুনো ফুলের গন্ধ। পাগল পাগল লাগছে ইতির। সে একই সঙ্গে আশ্চর্য এবং মুগ্ধ। দেবাদিত্য গোপন করেছে, বেশ করেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে পচা জায়গায় যাওয়ার থেকে নিঃশব্দে এমন সুন্দর জায়গায় নিয়ে আসা অনেক ভাল।

তবে গাড়ি থেকে নেমে যেমন ভাল লাগছে, তেমন এক ধরনের অস্বস্তিও হচ্ছে। কেন? অচেনা জায়গা বলে? নাকি সঙ্গের মানুষটা অচেনা? কাল ফুলশয্যা হলেও এখনও স্বামী হিসেবে চেনা হয়নি। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফুলশয্যার রাতে যে পুরুষমানুষ স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতি তাকে মোটেই পছন্দ করে না। এ আবার কেমন কথা! নিয়ম নাকি? একটা দিন তো সময় নেবে। আজ হয়তো.. সেই কারণে ভয় ভয়? হয়তো তাই হবে। কিন্তু তাহলে তো ভয়ের সঙ্গে

একধরনের চাপা উত্তেজনা, অপেক্ষায় গা শিউরে থাকার কথা। কই! সেরকম তো কিছু হচ্ছে না ইতির? কে জানে সবার হয়তো একরকম অনুভূতি হয় না।

টিলার ওপর কাঠের বাংলো। পাথরে ফুলের গাছ ঝুঁকে আছে। ফুল যেন পাথরের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে।

পাথর বলছে, 'তোমাকে দেখে হিংসে হয়। তুমি কত সুন্দর! সবাই তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়।'

ফুল বলছে, 'তুমিও খুব সুন্দর। তুমি আছো বলেই না তোমার কোলে ফুটতে পারি।'

পাইন গাছের ভিড়ে চারপাশ ছায়া ছায়া আর ঠাণ্ডা। ইতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় দেবাদিত্য মুখ ফিরিয়ে তাকালো। খানিকটা যেন বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হল?'

সম্বিত ফিয়ে এনে ইতি বলল, 'কিছু হয়নি। জায়াগাটা খুব সুন্দর।'

দেবাদিত্য চাপা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো।'

তাড়াতাড়ি এসো। তাড়াতাড়ি কেন? ইতি অবাক হল। তাড়াহুড়োর কী আছে? এখানে তো ট্রেন, প্লেন ধরার ঝামেলা নেই। কথাটা বলতে গিয়েও ইতি চুপ করে গেল। কী দরকার? মানুষটা যদি রেগে যায়। তার থেকে বরং একটু জোর পায়ে যাওয়া যাক। যে এমন সুন্দর জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে তার ভারিক্কি মেজাজ হলেও সমস্যা নেই। কম বয়েসের চ্যাংড়া বেয়াড়া বর না হয়ে ভালই হয়েছে।

তাড়াহুড়োর কারণ ইতি বুঝতে পারল একটু পরেই। বাংলোর কাঠের ঘরে ঢুকে। পুরুষমানুষের আদর যে এমন ঝোড়ো বাতাসের মতো পাগল করা হতে পারে তার কল্পনাতেও ছিল না। একটা সময়ে মনে হল, সে নিজেই যেন ফুল। পাথরের গায়ে এলিয়ে শুয়ে আছে কুয়াশা আর বুনো গন্ধ মেখে। একসময় ক্লান্ত দেবাদিত্য বিছানা থেকে নেমে কাঁচের জানলার সামনে গিয়ে সিগারেট ধরালো। নরম গলায় কথা বলল।

'ভাল লেগেছে ইতি?'

ইতি চুপ করে রইল। তার লজ্জা করছে। ভীষণ লজ্জা করছে। এরকম করে কেউ বলে নাকি? দুষ্টু একটা। ভাল লেগেছে মানে! এমন ভাল তার জীবনে কখনও লাগেনি। পুরুষমানুষের আদর এত যে ভাল লাগতে পারে তা জানা ছিল না। হয়তো অভিজ্ঞ বলেই এত মধুর। এত নিপুণ। ইতিকে প্রায় কিছুই করতে হয়নি। হলেও পারত না। সে এসব কিছুই জানে না।

'আজ সন্ধেবেলা আরও ভাল লাগবে।'

ইতি কম্বল থেকে বেরোতে পারছে না। সে নগ্ন। মানুষটা যতই তার স্বামী হোক সামনে থেকে না সরলে কিছুতেই এই অবস্থায় সে বেরোতে পারবে না। এই অভ্যেসের জন্য সময় লাগবে। ইতি গাঢ় গলায় বলল, 'সন্ধেবেলা কী হবে?'

দেবাদিত্য জানলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

'এটাই তো খুব সুন্দর জায়গা।'

দেবাদিত্য দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'না, আরও সুন্দর জায়গা।'

সন্ধের আগেই পাহাড় বেয়ে উঠে গেল দুজনে। হেঁটে প্রায় আধঘণ্টা। গোটা পথ চুপ ছিল দেবাদিত্য। ইতির ভাল লাগছিল, পাহাড় আর সমুদ্রের কাছে চুপ থাকতে হয়। এক জায়গায় এসে দেবাদিত্য বলল, 'এখানে।'

ইতি অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো। এখানে কী? আহামরি কিছু নেই তো! একপাশে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, অন্যপাশে নিচে নেমে গেছে খাদ। অনেক নিচে শুধু জঙ্গল। জনমানব শূন্য পাহাড়ি পথ একটা। হয়তো ওই পথ ব্যবহার হয় না অনেকদিন।

দেবাদিত্য বলল, 'এসো এই পাথরটায় বসি।'

অবাক হল ইতি। খাদের ওপর এই ঝুলে থাকা পাথরে বসতে হবে। ঠিক সেই সময় ঝপ করে অন্ধকার নামল। পাহাড়ে এমনই হয় হঠাৎ সন্ধে নামে।

'কী হল বসতে বললাম না?'

দেবাদিত্যর গলায় হঠাৎ যেন হুকুমের ঢঙ! ইতি একটু চমকে উঠল। পাথরের ওপর বসে বুঝতে পারল তার ভয় করছে। সে দেবাদিত্যর গা ঘেঁষে বসতে গেলে দেবাদিত্য সরে গেল। মাথার ওপর দিয়ে পাহাড়ি কোনও পাখি ডানা ঝাপটিয়ে চলে যায়। ওদিকের পাহাড়ে কারা যেন আগুন জ্বেলেছে। আগুন নাকি আলো? কনকনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। কোটের ভিতরও ইতির কাঁপুনি লাগল।

'এই সেই জায়গা।'

দেবাদিত্যর গলা শুনে চমকে উঠল ইতি। এ কার গলা! যেন ঘোর লাগা! সে দাঁত কামড়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কোন জায়গা?'

দেবাদিত্যর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ইতির মনে হচ্ছে, এরপর অন্ধকার আরও বাড়বে। তখন আর শুধু মুখ নয়, মানুষটার শরীরও দেখা যাবে না।

দেবাদিত্য ফিসফিস করে বলল, 'এখানেই মণীষা আত্মহত্যা করেছিল। এই খাদে। ঠিক এই অন্ধকারে । সন্ধে তখন সবে নেমেছে।'

কেঁপে উঠল ইতি। কোনওরকমে ঢোক গিলে বলল, 'মনীষা! মনীষা কে?'

অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু ইতির মনে হল তার স্বামী হাসল।

'আমার স্ত্রী। আমার আগের স্ত্রী।'

ইতি কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অস্ফুটে বলল, 'আত্মহত্যা! ইস্ কেন?'

দেবাদিত্য চাপা গলায় বলল, 'ঠিক এই ভাবে বসে ছিল আমার পাশে। এই পাথরে। তোমার মতোই হাত দুটো কোলের ওপর রেখে বসেছিল। হঠাৎই ঝাঁপ দিল।'

আর্তনাদ করে উঠল ইতি, 'সে কী!'

দেবাদিত্য ফিসফিস করে বলল, 'পরে শুনেছি, সে নাকি অন্য কাউকে ভালবাসত।'

ইতির মনে হল, এখনই উঠে ছুটে পালিয়ে যাই।

দেবাদিত্য গভীর গলায় বলল, 'বোকা মেয়ে একটা। বিয়েতে রাজি না হলেই পারত। আত্মহত্যার কী ঘটেছে?'

ইতি কাঁপা গলায় বলল, 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। চলো আমরা বাংলোতে ফিরে যাই।'

দেবাদিত্য ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না, মনীষা আসবে। তোমাকে দেখবে। খুব অল্প দিন হলেও আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাকে বলব, চিন্তা কোরো না, আমি ভাল আছি। এই দেখ আমার নতুন বউ। আমি নিশ্চিত সে আমার এই বিয়েতে খুশি হবে। খুব খুশি হবে।'

কথা বলতে বলতে দেবাদিত্য ইতির হাত চেপে ধরল। নিজেকে পাথরের মতো মনে হচ্ছে ইতির। সে কী করবে? এই উন্মাদ মানুষটার হাত ছেড়ে পালাবে? নাকি মানুষটার হাত ধরে বসে থাকবে গভীর ভালবাসা নিয়ে?

কতক্ষণ বলা যাবে না, হয়তো অনন্ত সময়, হয়তো একটু পরেই, একসময় ইতির মনে হল, খাদ থেকে আলো হাতে উঠে আসছে এক নারী। তার মুখ দেখবে বলে।

বাড়িতে বিজয়ার মিষ্টি !

প্রতিবছরই পুজোর সময় কিছু না কিছু মিষ্টি বাড়িতে তৈরি হয়। অবশ্য আজকাল বাজার চলতি মিষ্টি দিয়েই বিজয়া সারার রেওয়াজ বেশি। তাও শখ তো হয় বাড়িতে মিষ্টি তৈরি করার। এমনকী চাকুরে মহিলারাও পুজোর কদিন বাড়িতে নিজেরাই কিছু না কিছু স্পেশাল করেন। তাই এবার সুবিধার পাঠককুলের জন্য **সুমিতা শূর** এমন কিছু বিশেষ মিষ্টির হদিশ দিয়েছেন যা অতি পরিচিত ও চির লোভনীয়। ট্রাই করে দেখুন না, কী হয়।

নিখুঁতি

কী কী লাগবে

ছানা : ১ কেজি ; ময়দা : ১৫০ গ্রাম ; ক্ষীর : ১৫০ গ্রাম ; চিনি : ১½ কাপ ; গাওয়া ঘি : ২ কেজি ; গোলমরিচ : ১ চামচ ; খাবার সোডা : ½ চা চামচ ; চিনি : ২ কেজি ও জল রস তৈরির জন্য।

কী করে করবেন

প্রথমে ছানার সঙ্গে ময়দা, ক্ষীর, চিনি অল্প গাওয়া ঘি, গোলমরিচ ও সামান্য খাবার সোডা মিশিয়ে নরম করে মাখুন। এটি ৫ মিনিট রাখুন। একটি ঝাঁঝরির উপর এই মিশ্রণটি হাত দিয়ে চেপে দিন। ছোট ছোট টুকরো বের হবে। এগুলো ঘি গরম করে তাতে লালচে করে ভেজে তুলুন। চিনি ও জল এক সঙ্গে ফুটিয়ে রস তৈরি করুন। ভাজা নিখুঁতি রসে ফেলুন। ২-৩ ঘণ্টা পর তুলে পরিবেশন করুন।

চিত্রকূট

কী কী লাগবে

ময়দা : ৮০০ গ্রাম ; ছানা : ১ কিলো ; চিনি : ২০০ গ্রাম ; বেকিং সোডা : ½ চা চামচ ; বড় এলাচ দানা : সামান্য ; ঘি : ভাজার জন্য প্রয়োজন মতো ; চিনি : ১ কিলো ও জল : পরিমাণ মতো।

কী করে করবেন

প্রথমে ময়দা, ছানা, চিনি, বেকিং সোডা, এলাচ দানা ও আধ চামচ ঘি দিয়ে মেখে মন্ড তৈরি করুন। এটি থালার উপর রেখে চৌকো করে কেটে নিন। ঘি-এ লাল করে ভেজে তুলুন। অন্যদিকে সমপরিমাণ চিনি ও জল ফুটিয়ে রস তৈরি করুন। ঘি-এ ভাজা মিষ্টি রসে ডুবিয়ে তুলে ফ্রিজে রাখুন। চিনির একটা আস্তরণ পরবে। পরিবেশন করুন।

সরভাজা

কী কী লাগবে

ক্ষীর : ৫০০ গ্রাম ; সর : ৫/৬ টি পিস ; গাওয়া ঘি : পরিমাণ মতো ; চিনি : ২৫০ গ্রাম ; জল : ১০০ মিলি।

কী করে করবেন

কড়াতে দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ঠাণ্ডা করে ফ্রিজে ৬/৭ ঘণ্টা রাখুন। সর পড়বে। সর তুলে একটি পাত্রে রাখুন। অন্য দিকে কড়াতে জল, চিনি, ক্ষীর এক সঙ্গে গরম করুন। এক পিস সর পাটাতনের উপর রাখুন। খুন্তির সাহায্যে গরম ক্ষীর সরের উপর লেপে দিয়ে আর একটা সর তার উপর দিন। এইভাবে চার পাঁচটি সর ও ক্ষীরের পিস তৈরি করুন।

কড়াতে ঘি গরম করে এগুলো ভেজে তুলুন। ঠাণ্ডা হলে আরও ছোট ছোট পিস কেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

মাতৃভোগ

কী কী লাগবে

ময়দা : ৮০০ গ্রাম ; ছানা : ২ কিলো ; চিনি : ১৫০ গ্রাম (মাখার জন্য) ; বেকিং সোডা : ১৫ গ্রাম; বড় এলাচ দানা : সামান্য ; ঘি : ৫ কেজি (ভাজার জন্য) ; চিনি : ৫ কিলো (রসের জন্য) ; জল : পরিমাণ মতো (রসের জন্য)।

কী করে করবেন

ময়দা, চিনি, ছানা, বেকিং সোডা, বড় এলাচ দানা ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণ হাতের তালুতে চাপ দিয়ে নরম করে গোল করে কেটে নিন। অন্যদিকে চিনি ও সমপরিমাণ জল ফুটিয়ে ঘন করে রাখুন। কড়াতে ঘি গরম করুন। এবার গোল করে কাটা জিনিসটা ঘি এ ভেজে চিনির রসে ডুবিয়ে নিন।

রস কদম্ব

কী কী লাগবে

ছানার রস গোল্লা করতে ছানা : ৫০০ গ্রাম ; ময়দা : ১০০ গ্রাম ; চিনির রসের জন্য চিনি : ১ কিলো ; পোস্ত : প্রয়োজন মতো ; ক্ষোয়াক্ষীর : ৫০০ গ্রাম।

কী করে করবেন

ছানার রসগোল্লার জন্য ছানা ও ময়দা ভাল করে মিশিয়ে মেখে নিন। রসের জন্য রাখা চিনির থেকে ১০০ গ্রাম আলাদা করে বাকিটা জলে দিয়ে রস ফুটতে দিনি। ময়দা ও ছানার মন্ড থেকে গোলাকার রসগোল্লা গড়ুন। চিনির রস ফুটে উঠলে, তাতে গোল রসগোল্লা গুলো দিন। স্পঞ্জি হয়ে ফুলে উঠলে রসগোল্লা তুলে নিন। ক্ষোয়াক্ষীর ও ১০০ গ্রাম চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে কড়ায় গরম করুন। চিনি গলে পেস্ট-এর মতো হলে নামিয়ে নিন। ঠাণ্ডা ও মাখা মাখা হলে ক্ষীরের বল তৈরি করুন। তার মধ্যে রসগোল্লা পুরে গোল করুন। শুকনো খোলায় পোস্ত ভেজে রসগোল্লা ভরা ক্ষীরের গোল মিষ্টি তাতে গড়িয়ে নিন। তৈরি হল রস কদম্ব।

মনোহরা

কী কী লাগবে

ছানা : ৫০০ গ্রাম ; চিনি : ১৫০ গ্রাম ; এলাচ : ১৫ গ্রাম ; পেস্তা : ২৫ গ্রাম ; কাজুবাদাম : ২৫ গ্রাম ; কলাপাতা : ৪/৫ টি ; চিনি : ১$^{১}/_{২}$ কেজি ; জল : রসের জন্য।

কী করে করবেন

ছানা, চিনি মিশিয়ে পাক দিন, এলাচ, পেস্তা, কাজুবাদাম মিশিয়ে গোলাকার সন্দেশ বানান। চিনি ও জল ফুটিয়ে ঘন করে চিনির রস তৈরি করুন। সন্দেশ রসে ডুবিয়ে কলাপাতায় রাখুন। চিনির কোটিং শক্ত হলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।

উৎসব সংখ্যা

দাদারা

বাণী বসু

বসত বাড়িটা আমাদের বহু পুরনো। ঠাকুরদার যৌবন বয়সে, রীতিমতো ভাল মালমশলা দিয়ে তৈরি। দেখলেই বোঝা যায়। দালান বা সিঁড়ির কী সাইজ! রান্নাঘরটা কত বড়! মেঝেগুলো চমৎকার লাল বা সবুজ, ভাল করে মুছলেই পালিশের মতো চকচক করতো। কখনও কোনদিন তাতে ফাটল দেখিনি। জানালা দরজা কড়ি গুলো ঘন সবুজ রঙে ঝকঝক করতো। সে সময়ে ঠাকুরদার খুব অবস্থা। শুনেছি উনি শেয়ার বাজারে প্রচুর টাকা করেছিলেন। বাবা ও রকম অ্যাডভেনচারাস ছিলেন না মোটেই! ভাগ্যিস! চাকরি করতেন মন দিয়ে আর গৃহস্থর যা কিছু কর্তব্য খুঁটিয়ে পালন করতেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, একটা চুনকাম বছর দুই তিন অন্তর অন্তর তিনি করাবেনই। তখন কোথায় বাড়ির গায়ে গাছ হয়েছে অ্যাসিড দিয়ে সে সব পোড়ানো, কোথায় টালি খসেছে, চাঙড় খসে পড়েছে, দেয়াল ফেঁপেছে সব সারাই ঝালাই হবে আর পড়বে নীল মেশানো দু কোট চুন, অমনি হেসে উঠবে বাড়িটা। কলি ফেরানোর সময়টায় আমাদের বড় আনন্দ হতো। বড় বয়সেও। মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, কে যেন গেয়ে উঠত মনের মধ্যে।

আমরা তিন ভাই। বড় দুই দাদা আমার অনেক আগে পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে ঢুকে গেছে। আমি যখন বিয়ে করলুম বড়দার বড়ছেলে বাবুই তখন আমার ভীষণ ন্যাওটা। যখন তখন ওর জন্যে খেলনা কিনে আনি। ওকে কোলে করে কিম্বা ওর হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাই। ছোটটা হল মেয়ে। আমার স্ত্রী শম্পি তাকে নিয়ে একেবারে পাগল। সে-ই তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছিল বলতে গেলে। এই তার লাল ঘুরনচাকি, ওই তার প্লাস্টিকের হাঁস, নতুন নতুন জামা, নিজেই সেলাই করছে, নিজেই আনন্দ করে পরাচ্ছে। বড়বৌদি নিশ্চিন্তে সংসার করতে থাকল। বাচ্চার হ্যাপা পোয়াতে বৌদি একদম ভালবাসত না।

মেজদার বিয়ে হয়েছিল আমার পরে। এবার ঝটপট বাচ্চা হয়ে গেল। ভারি একটা ধুন্ধুমার লেগে গেল এই সময়টায়। মেজবৌদির নানা রকম বাতিক ছিল, বাচ্চাকে বেশি কোলে টোলে নেওয়া পছন্দ নয় তার, স্টিমে নানারকম তরকারি সেদ্ধ করে তার জুস ছেঁকে খাওয়াবে, তার কাপড়জামা আলাদা কাচা হবে সে সবের জন্য একজন আয়া রাখল সে। ওয়াশিং মেশিন এলো, তাতে নাকি আর কিছুই কাচা যাবে না। ফ্রিজটা তো বড়দা কিনেছিল, টিভিটা, দুটো প্রেশার কুকার আমার কেনা। এতদিন সবই তো আমাদের এজমালি ছিল। সেই ভাবেই আমরা ভাবলাম ওয়াশিং মেশিনটাও ব্যবহার করবো। কিন্তু মেজদার কেনা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে গিয়ে মহা বকুনি খেলো শম্পি। কেঁদে কেটে একেক্কার! তার পর দেখি লোকজন সবাইকেই আলাদা আলাদা পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নিচ্ছে মেজবৌদি, তার সেই আয়া তো বাচ্চার কাজের জন্য আছেই, কিন্তু বাড়ির আর লোকেরা সব মেজবৌদির বশংবদ। আশ্চর্যের কথা বড়ও এতদিন পরে সেই পথই ধরলো। লোকজনেরা কিছু দিনের মধ্যেই ওদের দুজনের পেটোয়া হয়ে গেল। অবস্থাটা ক্রমে এ রকম দাঁড়ালো, যে কমন ফান্ডে যা টাকা পয়সা দেবার দিচ্ছি, কিন্তু লোকজনেরা ওদের কাজ গুলোই ঠিকঠাক করছে, আমার পায়জামা, শম্পির পেটিকোট এ সব কাচতে লোকে ভুলে যাচ্ছে, আমাদের ঘরখানাতে ন্যাতা পড়লো না। আজ বড় বৌদিদির ঘরে বেশি কাজ ছিল ছোট বৌদিদি, কাল তোমার ঘর মুছে দেবো। এই রকম!

আলাদা জলখাবার চালু হয়ে গেল দু ঘরেই। রান্নার বামনি আমি অফিস থেকে ফিরলে বিস্বাদ ঘুগনি কিম্বা জলো হালুয়া এনে হাজির করে। অনেক দিনের লোক, মুখ বেঁকিয়ে বলে, ছোড়দাদা এ কী রকমের সংসার হয়েছে তোমাদের? জন্মে দেখিনি এমন ছোটলোকামি! ছিঃ। মা থাকলে এমনটা হতে

পারতো না। আর মা! তিনি ভালয় ভালয় বাবার পরই চলে গেছেন, এসব নীচতা হ্যান্ডেল করার মতো ডাকাবুকো তিনি ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। থাকলে শুধু কষ্টই পেতেন। শম্পিকে বললুম কী করা যাবে তুমিও আলাদা জলখাবারটা অন্তত চালু করো, নইলে তো আর বাঁচি না।

কিন্তু কমন ফান্ডে টাকা ঢেলেও কত আর আলাদা করবো? বাড়ি সারাবার সময়ে সকলে পরামর্শ করে শুরু হল কাজটা। সবাই দিলেও যে যার শেয়ারটা। এখন এ সব কাজে হাত দিলে খরচ তো এক জায়গায় থামিয়ে রাখা যায় না। নিচের কলঘরটা ওপর ওপর সারাতে গিয়ে দেখা গেল ভেতর অবধি ঘুন ধরে গেছে। ছাতে প্যারাপেট একদিকে সারাই করতে গিয়ে অন্য দিকটাও ভেঙে পড়ল। কতদিনের পুরোনো বাড়ি তো! তা এইসব অতিরিক্ত টাকা কেউ দিতে চাইল না। বলল— তোমার প্ল্যান, তোমার লোক, দায়ও তোমার, আমরা জানি না। বাহ। আমি বলতে পারতুম বেশি জায়গা নিয়ে থাকো তোমরা, দেবে না মানে? আমাদের তো শুধু একখানা ঘর, দালানে মেজবৌদির রীতিমতো একখণ্ড রান্নাঘর, কিচেনেট যাকে বলে, তার ওপাশে আবার সেই ওয়াশিং মেশিন। তার জল বেরিয়ে বেরিয়ে দালানের একদিকটা হেজে গেছে। একটা পুরো ঘর বাবুইয়ের জন্য ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শুধু গজগজ করাই সার, এ সব কথা মুখ ফুটে বলতে পারলুম কই?

কোথাও বাড়ি শুদ্ধু নেমন্তন্ন হল, তো সবার টাকা দিয়ে উপহার কেনা হল, গেল দাদার নামে, দাদা কিনা বড়! লোকেও তেমন, তারা ভেবেও নিল দাদাই দিয়েছে। এই নিয়ে একদিন দুই বৌদিদি আর দাদার মধ্যে তুলকালাম! এই সব উঞ্ছ-নীচতা ভাল লাগে বলুন?

শম্পি একদিন বলল, যৌথ পরিবারের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, আমি আর পারছি না, আমার দম আটকে আসছে।

বেচারির তখন বাচ্চা হবে, তাকে সাধ খাওয়ানো হল, আমার পকেট ফাঁকা করে। কে নয়? বড় বৌদি, মেজবৌদির বাপের বাড়ি একেবারে গুষ্টিশুদ্ধু। মাঝ থেকে আমার বন্ধুর স্ত্রী দুজন, আর শম্পির তিন প্রাণের বন্ধু বাদ পড়ে গেল। ওরই নাকি সাধ, বুঝুন! ওরা যাচ্ছে, ওরাই নেমন্তন্ন করে আসছে, ওরাই উৎসাহ দেখিয়ে মেনু ঠিক করল আমার মুণ্ডুপাত করে, ছাতটা আবার ঘেরা হল, এতবড় যজ্ঞি বলে। সব আমার খরচ। কে করতে চেয়েছে এত বড় যজ্ঞি? আমার বলে এখন শিয়রে শমন অবস্থা! রোগা বৌটা যা কাহিল হয়েছে, ফিরলে বাঁচি, দিবারাত্র দুশ্চিন্তা। যদিও অফিস থেকে এ খরচ আমি পাবো, কিন্তু পরবর্তীটুকু? তখন কে সামলাতে আসবে? আমার দুই বৌদিদি? সে গুড়ে যে বালি সে অনেক দিনই বোঝা হয়ে গেছে।

লোটনসোনা হলে অবশ্য কিছুদিন অন্তত আমার বা তার মায়ের কারোই কোনদিকে তাকাবার অবসর বা ইচ্ছে ছিল না! একজন লোক রাখলাম, সাতটা থেকে সাতটা, খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা নেই বাবা। শুধু টিফিন, সেটা শম্পিই দিয়ে দেয়। আমার বৌয়ের জন্য ফল ছানা দুধ এ সবের ব্যবস্থা আমি করেছি। কিন্তু সংসারে যদি আলাদা কিছু দিইও, মোটা

ডালভাতের বেশি কিচ্ছু ওর জুটবে না জেনে গেছি। তখন আমিও ওই পথ ধরলুম। বামনিকে মুরগি কিনে এনে দিই আমাদের দুজনের মতো, মাছ আড়াইশ গ্রাম ধরা শম্পির জন্যে, বলি আলাদা করে রেঁধে দিও বামুনদি, এক সঙ্গে মিশিও না।

তা একদিন বড়দা ডেকে বললে, খোকন তোর কি ধারণা মাছটা একসঙ্গে রান্না হলে বৌমা ঠিকঠাক ভাগটা পাবে না? বোঝাই যাচ্ছে বড়বৌদি দাদাকে লড়িয়ে দিয়েছে।

গম্ভীর ভাবে বললাম, ডাক্তার বলেছে প্রতিদিন একটা ডিম, আড়াইশ গ্রাম মাছ বা মুরগি ওজন করে খেতে দেবেন। আমি সেই নির্দেশ পালন করছি মাত্র। দাদা চুপ করে গেল। এখন ওদের যদি বলতে যেতাম তোমরা দিনের পর দিন কী করে চলেছো? আমাকে কেউ ছেড়ে দিত? দিত না।

সেই থেকেই আমার মনে বীজ পড়ল আলাদা সংসার, আলাদা বাড়ি সংসার, আলাদা বাড়ি অর্থাৎ ফ্ল্যাট। এ ভাবে আর নয়। লোটন চিতপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে, আর আমরা গুনগুন করে আলোচনা করছি। ছেলেটা বড় হবার আগেই, দাদা, দিদি, জ্যাঠাই জ্যাঠা এ সব চক্করে জড়িয়ে পড়বার আগেই যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট ছেলের মনে লাগুক এটাও আমরা চাই না, ছোট ছেলে এ সব দেখে নীচ, স্বার্থপর তৈরি হোক সেটাও আমাদের কাম্য নয়। যে বাবুই ছোটকা না হলে খেতে চাইতো না সে এখন উদ্ধত ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে। শম্পি যাকে ছোট্ট থেকে দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, চান করিয়ে বড় করলো সেই ঝুম্পাকে তার মা আমাদের কাছে ছাড়েই না। মেজবৌদির মেয়ে আনন্দী তো মানুষ হচ্ছে এমন ভাবে যে বাড়ির কারও সঙ্গে মেলামেশা করার তার সময়ই নেই। স্কুল থেকে এসেই খাও, ঘুমোও, বিকেল হলেই বাধ্যতামূলক পার্কে বেড়াতে যাওয়া, তার পরই সে নাচ শিখতে চায়, নাচের পরে আঁকা, তার পর যখন বাড়ি আসে, দু ঘা খেয়ে কোনওক্রমে একটু চোখ বোলানো পড়া আর দু' গরস খেয়ে ঢুলে পড়া ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। দেখতে দেখতে শম্পি বলে তার কান্না পায়, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই।

লোন নিয়ে ফ্ল্যাট বুক করলাম। হতে হতে দেড় বছর কেটে গেল, তার পর একদিন শুভদিন দেখে কথাটা সবাইকে জানিয়ে নিজেদের ঘরটাতে তালা দিয়ে ফ্ল্যাটের সংসারে চললাম। আহ, কী আনন্দ, কী মুক্তি! নিজের বাড়ি ছাড়ার দুঃখ তো যাবে না। কিন্তু বদলে মানুষের মতো ব্যবহার পাবো, কারো সঙ্গে কিছু শেয়ার করতে হবে না, প্রত্যাশা কিছু থাকবে না, যেমন পারবো তেমন চালাবো।

বেশ ফ্ল্যাট। পুব-দক্ষিণ খোলা, তিনতলা, লিফট আছে। হল ছাড়া দু খানা বেশ বড় শোবার ঘর, দুটো টয়লেট, দুটো বারান্দা, সুন্দর ব্যবস্থাযুক্ত আধুনিক রান্নাঘর। হাউজিং এর সেক্রেটারি সদাশয় লোক, বললেন, কী জানেন, আমরা চাই মেনটেন্যান্সটা ভাল হোক। আর মানুষ যাঁরা থাকবেন তাঁরা হবেন সত্যিকার ভদ্রলোক। কী বলেন? নিশ্চয়! ভদ্রলোকের একটু স-এর দোষ আছে, কিন্তু এনজিনিয়ার মানুষ। বেশ করিৎকর্মা। আমাদের বললেন, আমাকে দাদা বলে মনে করবেন, কিছু প্রয়োজন হলে,

অসুবিধে নিঃসঙ্কোচে বলবেন। মনে মনে বলি, দাদা হয়ে আর দরকার নেই, প্রতিবেশী জেনেই এসেছি, প্রতিবেশীর কাছে যতটুকু আশা থাকে তার চেয়ে বেশি আশা করবো না!

খুব বড় হাউজিং নয়, দুটো ব্লকে আটটা করে ফ্ল্যাট, মোট ষোলটা। নিচের তলায়, মানে গ্রাউন্ডে, গাড়ি রাখবার জায়গা। আলাদা আলাদা করা নেই সে ভাবে। কিন্তু আছে। আমি অত খেয়াল করিনি, কিন্তু শম্পি একদিন বলল— আচ্ছা, সবাইকার তো গাড়ি নেই, আমাদের তো নেইই, কিন্তু আমি রোববারে দেখলাম গাড়ি ষোলটাই আছে। কী করে হয়? তুমি একটা খোঁজ করো তো! খোঁজ করতে আর কোথায় যাবো? সেক্রেটারি চ্যাটার্জিদার কাছে গেলাম। উনি বললেন— আরে একটা গ্যারাজ তো এক ঝুনঝুনওয়ালার। ও এখানে থাকে না। শুধু গাড়ি রাখে। আরেকটা আমার দ্বিতীয় গাড়ির জন্যে কিনেছি।

—মানে?

—মানে আর কি! প্রোমোটার বেচেছে ওইভাবেই।

—তা হলে আমি যখন গাড়ি কিনবো, কোথায় রাখবো, আমি তো গ্যারাজশুদ্ধু ফ্ল্যাটের দামই দিয়েছি।

—দেখি আপনার দলিল?

আমার দলিল দেখে উনি বললেন, দেখুন আপনার দলিলে গ্যারাজ বলা আছে ঠিকই, কিন্তু তার কী মাপ, কী নকশা কিচ্ছু নেই। এরা এই রকম সব ফাঁক ফোকরা রাখে। আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

—তার মানে চ্যাটার্জিদা আমি ঠকে গেলাম! অথচ দাম হিসেবে যা দিয়েছি আপনাদের কারও চেয়ে বেশি বই কম দিইনি! এ কী রকম অন্যায্য কথা?

চ্যাটার্জি বললেন, গ্যারাজ যখন বলা আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হতে বাধ্য। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে লোন নিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেললাম।

কোথায় রাখবো? কোথায় রাখবো? চ্যাটার্জিদা বললেন, করপোরেশনের রুল রয়েছে, পাকা কিছু তো তোলা যাবে না। আপনি ডান দিকটা ঘেঁষে বরং একটা শেড ফেলে দিন। তার তলায় রাখুন।

—বেশ। কিন্তু দাদা, একা আপনার কথায় করবো আর পাঁচজন মানবে কেন?

সুতরাং অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং হল, স্ট্যাম্প পেপার এলো, তাতে সবাই দস্তখৎ করলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সবাই আমার আপন দাদা। মনটা কী রকম আলোয় আলো হয়ে গেল। সে দিনের জলযোগের খরচটা আমিই দিলাম। না দাদা, না করবেন না, এটুকু আর এমন কী!

লোটনের জন্মদিনে ঢেলে খাওয়াবার বন্দোবস্ত করি। আমার নিজের দাদা-বৌদিরা আসে, আত্মীয়স্বজন আসে, তাদের খাতির যত্ন তো নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু একটু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াও দরকার আসল আত্মীয় সব সময়ে রক্তের সম্পর্কে হয় না। তাই দাদাদের সঙ্গে চ্যাটার্জিদা, ব্যানার্জিদা, মিত্তিরদা এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই, বলি, এঁরা আমার আপন দাদাদের চেয়ে মানে তোমাদের চেয়ে কম নয়। কী হেলপ্ যে করেন ভাবতে পারবে না।

দাদাদের মুখ গম্ভীর হল, হাসিটাও কাষ্ঠহাসি। তা কী করা যাবে! ছোট ভাইকে ছোট ভাইয়ের বৌকে তিষ্ঠোতে দাওনি, বাড়ি ছাড়া করে ছেড়েছ, এখন যারা সত্যি ভদ্দরলোকের মতো, মানুষের মতো, তাদের সুখ্যাতি করলে মনে করলে চলবে কেন?

লোটন এখন বছর চারেকের। দেড় বছরের মতো কেটে গেছে। চ্যাটার্জিদা ডেকে বললেন— বোস, একটা মুশকিল হচ্ছে। বুকটা ধক করে উঠেছে। মুশকিল টিল শুনলে ভয় লাগে।

কী ব্যাপার! না ঝুনঝুনয়ালা বলেছে সেও বাঁ দিকের দেয়ালের লাগোয়া একটা শেড ফেলে দেবে, খান দুই গাড়ি রাখতে পারবে।

—সে আবার কী?

ও বলছে, একজন যদি এমন করতে পারে তো সব্বাই করতে পারে।

—কিন্তু কথাটা তো ঠিক নয় দাদা! আমরা সবাই ফ্ল্যাট-ওনার সেই হিসাবে গ্রাউন্ডের ওপর আমাদের যৌথ অধিকার, আমরা যা পারি ঝুনঝুনওয়ালা একজন গ্যারাজ ওনার তো তা পারে না! বাকি জমির ওপর ওর কী রাইট আছে? কিচ্ছু নেই!

—ঠিক আছে, তা হলে আমাদের অধিকার আছে বলে মানছেন তো?

—মানা না মানার কী আছে, দ্যাটস আ ফ্যাক্ট!

—তাহলে বলি শুনুন, বেশ কয়েক জন আপত্তি তুলেছে। ব্যাড প্রিসিডেন্স হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। আপনি বরং শেডটা ভেঙে ফেলুন।

—সে কী? আপনারাই পারমিশন দিলেন, আপনারাই এখন বলছেন ভেঙে ফেলতে!

—ইয়েস, আমরাই বলছি ভেঙে ফেলতে। ল' এর এ দিকটা আমরা দেখতে পাইনি। স্যরি বলতে হবে?

আমি হাঁ। —আমার গাড়ি কোথায় থাকবে?

পেছন দিকে একটা কভার দিয়ে রেখে দেবেন, সমস্যা হবে না।

শম্পি বলল— জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। তুমি শেড ভেঙে দাও। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

আমি গোঁয়ারের মতো বলি, শেড আমি ভাঙবো না, আমার কষ্টের পয়সা গলে গেছে ওর ভেতরে, আবার পয়সা খরচ করে ভাঙবো! ইল্লি নাকি? যার ইচ্ছে হয় সে ভাঙুক। প্রসঙ্গত ওই শেডের নিচে যে কোন উপলক্ষে আমার গাড়ি সরিয়ে রান্না বান্না হতো। এর জন্মদিন, তার বিবাহবার্ষিকী হলেই হল, সব সময়ে পারমিশন পর্যন্ত নিত না। খটকা লাগত মনে কিন্তু মুখ বুজেছিলুম।

কদিন পরেই ঘং ঘং করে প্রচণ্ড শব্দে আমার গ্যারাজ ভাঙা হতে লাগলো। ভাঙ বাবা, ভাঙ। চ্যাটার্জি কোথাকার চিফ এঞ্জিনিয়ার, ব্যানার্জি বড় ব্যবসাদার, আমি মাস্টার মানুষ, পিএইচডি করেছি, অল্প বয়সেই রিডার হয়ে গিয়েছি তাই কী?

ঝুড়ি বোঝাই করে করে রাবিশ সরাচ্ছে সব দেখলাম, জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। তারপর একদিন শম্পি বলল, আমাদের গ্যারাজের জায়গাটা একবার দেখে এসো।

—কেন?

—দেখে এসো না!

ওমা! গিয়ে দেখি একটা ঝাঁ চকচকে নতুন সাদা ফোর্ড আইকন শোভা পাচ্ছে।

শম্পি বললো— দেখলে? ব্যানার্জির গাড়ি।

—হুঁ।

—দ্বিতীয় গাড়ির তো আর গ্যারাজ নেই। রাখার জায়গা পাচ্ছিল না।

—ওদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই?

—তোমার পাশে বসে গাদার বড় মাছটা খেতে তোমার দাদার কোনওদিন চক্ষুলজ্জা দেখেছো? সব যৌথই হরে দরে এক।

আপনাদের কাছে প্রতিবারই জোক্‌স বা ছোট কৌতুকের জন্য অনুরোধ জানাই। এবার তাই **সঞ্জয় দাস**-এর পাঠানো কিছু জোক্‌স রইল আপনাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। পাঠাতে থাকুন আপনাদের লেখা, এই পত্রিকা তো আপনাদেরই!

হাসির খোরাক

একদিন বাসের মধ্যে দামি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক উঠলেন, তাঁর পকেট মারার সময় এক পকেটমারকে হাতে নাতে ধরে ফেলে বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না, আমার পকেট মারছ।' পকেটমার বলল, 'লজ্জা তো আপনারই হওয়া উচিত। এমন দামি পোশাক পরেছেন, অথচ পকেটে একটা টাকাও নেই।'

● বিয়ের পর বিদায়ের সময় কনে খুব কাঁদছে, ছোট ভাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা দিদি এত কাঁদছে, কই জামাইবাবু তো কাঁদছে না! বাবা উত্তর দিলেন, ওরে দিদি তো খালি যাওয়ার সময় কাঁদছে। তোর জামাইবাবু তো সারা জীবন কাঁদবে।

● গভীর রাতে দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনে গৃহস্বামী দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলেন একজন ভিখারি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরক্ত হয়ে গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন, 'কী, ভিক্ষা নিতে দিনে আসতে পার না?'
ভিখারি বলল, 'হ্যাঁ বাবু, দিনেও এসেছিলাম এবং ভিক্ষা নিয়ে গিয়েছি। এখন ওভারটাইম করছি।'

● শ্যাম : কাল রাতে আমার ছোট মেয়ে মিনুকে নিয়ে যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। সারা রাতের ঠাণ্ডায় মেয়ের গলা বসে গিয়েছে। আজ আর কথা বলতে পারছে না।
বিধান : আজও মেয়েকে নিয়ে যাবে নাকি?
শ্যাম : না হে। আজ ঠিক করেছি, বউকে নিয়ে যাব। আজ আরও বেশি ঠাণ্ডা পড়েছে কিনা।

● ঘুম থেকে উঠতেই স্বামীকে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগো, আজ কী দিন বলতে পার?'
স্বামী খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'কেন বুধবার।'
স্ত্রী বললেন, 'আমি জানতাম, তুমি ঠিক ভুলে যাবে, ওগো, আজ আমাদের বিয়ের দিন। ঠিক ২৫ বছর আগে এই দিনটিতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ পালন করবে না?'
স্বামী বললেন, 'নিশ্চয়ই, ২৫ বছর ধরে আমরা ঝগড়াই করে এসেছি। আজ আমরা দু-মিনিট নীরবতা পালন করব।'

● বছর দশেকের ছেলেসহ এক ভদ্রলোক চিড়িয়াখানা গিয়েছেন। কৌতূহলী পুত্র আঙুল দিয়ে একটি জন্তু দেখিয়ে বলল, 'বাবা, ওটার নাম কী?'
বাবা জবাব দিলেন, 'এর নাম গাধা।'
গাধাটির পাশেই আর একটি গাধা দাঁড়িয়েছিল, সেটিকে দেখিয়ে ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা. ওই গাধাটি এই গাধাটির কে হয়?'
বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'স্ত্রী'।
ছেলে : বাবা গাধারাও বিয়ে করে?
বাবা : হ্যাঁ বাবা, একমাত্র গাধারাই বিয়ে করে থাকে।

সারা বছরের প্রতীক্ষার শেষে আবারও পুজো এসে গেল। কচি-কাঁচাদের মন খুশিতে ডগমগ। জুতো, জামা, প্রসাধনীর হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত। কোনদিন কোন জামা পরবে, কবে কোন প্যান্ডেলে যাবে, কী খাবে মনে মনে সে সব পরিকল্পনাও করে ফেলেছে। শিশুদের এসব পরিকল্পনা যাতে মাঝপথে নষ্ট না হয়, সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে মায়েদেরই। না হলেই বিপদ। কীভাবে পুজোয় শিশুদের সুস্থ রাখবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডা. শান্তনু রায়**

পুজোয় চাই সুস্থ শিশু

প্রশ্ন : পুজোর সময় শিশুদের পেট খারাপ মানেই বাড়ি শুদ্ধ লোকের আনন্দ মাটি। এ সময় পেট খারাপ কেন হয়?

উত্তর : পুজোয় শিশুদের পেটের অসুখের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী ফুড পয়জনিং। আর এর জন্য দায়ী বাইরের খাবার। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে অনেকেই রেস্তোরাঁয় কিংবা রাস্তার খোলা খাবার খায়। যার থেকে দেখা দেয় ডায়ারিয়া, টাইফয়েড এমনকী জন্ডিসও। এছাড়া রাত জেগে ঠাকুর দেখার ফলে অনেক সময় বাচ্চাদের ঘুম ঠিকমতো হয় না। এর ওপর আবার স্পাইসি খাবার খেলে তা হজম হতে চায় না। তখনই বমি, পেট খারাপের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্ন : এমন হলে কী করা দরকার?

উত্তর : পেটে কোনওরকম সমস্যা হলেই সতর্ক থাকতে হবে। যাতে ডিহাইড্রেশন না হয় তার জন্য প্রথম থেকেই নুন-চিনির জল কিংবা ও আর এস খাওয়াতে হবে। এতে কাজ না হলে, যদি সমস্যা বাড়তেই থাকে তাহলে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। দোকান থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনও ওষুধ খাওয়াবেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, শিশুর যাতে পেটের গন্ডগোল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। পুজোয় ভাল-মন্দ খাবার ঘরে তৈরি করে দিন। রেস্তোরাঁয় খেতে নিয়ে যাবেন না। অনেকক্ষণ বাইরে থাকার পোগ্রাম থাকলে সঙ্গে নিন ঘরের রান্না করা খাবার। অবশ্যই পরিশোধিত জলও সঙ্গে রাখবেন।

প্রশ্ন : সুস্থ বাচ্চা নিয়ে বেরলেন, অথচ ঠাকুর দেখার মাঝপথেই শিশুর হাঁচি, কাশি শুরু হল। এর কারণ কী?

উত্তর : পুজোর সময় প্রচন্ড ভিড়ে বেরনোর ফলে যাদের সর্দি-কাশি বা ভাইরাল ইনফেকশন থাকে তা সহজেই অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রমণ ছড়ায় এয়ার ড্রপলেটস অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। অনেক সময় নাক দিয়ে এই ভাইরাস শ্বাসযন্ত্র অক্রমণ করে। তখন নিউমোনিয়া, ব্রংকিওলাইটিস বাড়ে। এর থেকে মায়োকার্ডাইটিস এর মতো জটিল সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই শিশুর সর্দি, কাশি হলেই সাবধান হওয়া দরকার। বিশেষ করে যদি এর সঙ্গে গা-হাত-পা ব্যথা ইত্যাদি থাকে। অনেক সময় শিশুর আব্দার মেটাতে বাবা, মা কোনও সর্দি কাশির ওষুধ খাইয়ে আবার পরদিন ঠাকুর দেখাতে নিয়ে বেরন। এটা একদম উচিত নয়। প্রয়োজনে বাবা-মাকেও শিশুর সঙ্গে ঘরে বসে টিভিতে প্যান্ডেল, প্রতিমা দর্শন করতে হবে। শিশুর বয়স যদি ৫ বছরের মধ্যে হয় তাকে ভিড়ের মধ্যে নিয়ে না যাওয়াই শ্রেয়।

প্রশ্ন : পুজোর সময় তো আবার ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার প্রকোপও বাড়ে। কীভাবে সামলাতে হবে শিশুকে?

উত্তর : পুজোর সময় বৃষ্টির জমা জল থাকে বহু জায়গায়। যেগুলো ম্যালেরিয়ার আঁতুরঘর স্বরূপ। ডেঙ্গুর প্রকোপও বাড়ে। আর বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বলে তাদেরই এ অসুখগুলোতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। খেয়াল রাখতে হবে ঘরে যেন জমা জল না থাকে সেদিকে। ডেঙ্গুর মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনেও মশা তাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। দিনের বেলাতেও মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে হবে। আর যদি কোনওভাবে শিশুর জ্বর অস্বাভাবিক মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন : নতুন পোশাক থেকেও কি কোনও সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : শিশুর নতুন পোশাক সবসময় ধুয়ে নিয়ে পরানো ভাল। কখনওই সুতির ছাড়া অন্য কোনও মেটিরিয়াল-এর পোশাক পরানো উচিত নয়। সিনথেটিক জামাকাপড় থেকে শিশুর ত্বকে অ্যালার্জি হতে পারে। যাদের অ্যালার্জি-র প্রবণতা আছে কিংবা ত্বক খুব স্পর্শকাতর, সমস্যা তাদেরই বেশি হয়। তেমন অ্যালার্জি

হলে একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। তবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন সমস্যা না হয়, সেই ধরনের পোশাক পরানোর।

শুধু পোশাক নয় ছোট মেয়েরা মায়ের মতো সাজতে গিয়ে যে লিপস্টিক, কমপ্যাক্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে, এসব থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। কাজেই মায়েদের সাবধান হতে হবে শিশুর প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। বোঝাতে হবে যে ওদের নরম ত্বক এই জাতীয় জিনিস ব্যবহারের উপাযোগী নয়। প্রয়োজনে নিজের সাজের ক্ষেত্রেও লাগাম টানতে হবে।

প্রশ্ন : নতুন জুতো ছাড়া শিশুরা ঠাকুর দেখতে বেরবেই না। আর নতুন জুতো মানে ফোস্কা। এর থেকে মুক্তির উপায়?

উত্তর : পুজোর জুতো কিছুদিন আগে কিনে ঘরে সেটা পরিয়ে হাঁটা অভ্যাস করলেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু শিশুরা যে তা করতে চাইবে না এটা ধরেই নেওয়া যায়। তাই নতুন জুতো পরানোর আগে পায়ে নারকেল তেল বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দিন। পায়ে যদি তা সত্ত্বেও ফোসকা পড়ে তাহলে পুরোপুরি না সেরে যাওয়া পর্যন্ত অন্য পুরনো জুতো পরতে দিন। কারণ ফোস্কা গলে গিয়ে সেপটিক হয়ে গেলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

প্রশ্ন : যাদের অ্যাজমা আছে তারা কী ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারে?

উত্তর : যে সব শিশুদের অ্যাজমা আছে তাদের আগে থেকেই প্রিভেনটিভ ইনহেলার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই সময়ে শ্বাস কষ্টের রোগিদের প্রায়ই সমস্যা বাড়ে। তাই আগে থেকে ইনহেলার নিলে অনেক সুস্থ থাকতে পারে, ভালয় ভালয় পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে হয়। অ্যালার্জির থেকে যাদের অ্যাজমা হয় তাদেরও কিছু কিছু ওষুধ আগে থেকে খাওয়ালে সমস্যা বাড়তে পারে না।

প্রশ্ন : পুজোর সময় দীর্ঘক্ষণ বাইরে কাটানোর জন্য আর কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : অনেকটা সময় বাইরে থাকার জন্য অনেকেরই পাবলিক ইউরিনাল ব্যবহার করতে হয়। ওইসব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে অনেক সময় বাচ্চাদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটি আই-এর সমস্যা হয়। এই সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি শিশুর জ্বর থাকে, ইউরিনের কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ইউরিন টেস্ট বা কালচার করাতে হবে। আর বেশি করে জল খাওয়াতে হবে।

সুস্থ রাখার সহজ উপায়

- বাইরের খাবার জল একদম খাওয়া চলবে না।
- সর্দি-কাশি, জ্বর হলেই সাবধান হতে হবে।
- শিশুর জন্য সিনথেটিক পোশাক কিনবেন না, কাউকে উপহারও দেবেন না।
- শিশুকে প্রসাধনী ব্যবহারে বিরত রাখুন।
- নতুন জুতো পরানোর আগে নারকোল তেল বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিন।
- ঘরে জমা জল রাখবেন না।
- দিনের বেলাতেও মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। মশারি টাঙিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ান।
- শিশুকে বেশি করে জল খাওয়ান। এতে ডিহাইড্রেশন সহ অনেক সমস্যা থেকে দূরে রাখতে পারবেন।
- রাত জেগে ঠাকুর দেখাবেন না।
- শুধু চাউমিন, ফুচকা, বিরিয়ানি নয়, মিষ্টি খাওয়ানোর ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। মিষ্টিতে যে সব রং মেশানো হয় তা অনেকক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।
- পুজোর জামাকাপড় কেনার সময় দু-এক প্যাকেট ও আর এস কিনে রাখুন। বিপদে কাজে আসবে।

পুজোর সাজ

পুজো মানেই হই হই, সাজ সাজ! তাই এবারের পুজোয় কেমন সাজ সাজতে পারেন, তারই হাল হদিস রইল। শাড়ি বা পোশাক ছাড়াও, পুজোয় গয়নাও সাজের অঙ্গ। কেমন গয়না পুজোয় পরবেন জেনে নিন সেটাও।

অঞ্জনা বসুর পুজোর সাজ সাদা লাল পেড়ে শাড়ি ও সোনার গয়না। এই সাজ 'বধূবরণ' বা সিঁদুর খেলা সর্বক্ষেত্রেই যথাযথ।

অর্পিতা চ্যাটার্জি ট্র্যাডিশনাল ও আধুনিক দুই ধরনের সাজেই অনবদ্য। পুজোর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সাজ ও সোনার গয়না ওর পছন্দ।

লকেট চ্যাটার্জি সাজগোজ ব্যাপারে খুবই তৎপর। পুজোয় এদিক ওদিক যেতে হয় কাজে বা আনন্দে। তাই এমন গয়না ও শাড়ি ওঁর পছন্দ যা দিনে রাতে যে কোনও পরিবেশে মানানসই।

মিমি চক্রবর্তী, এখন নতুন নায়িকা। 'বাপী বাড়ি যা' ছবিতে অভিনয়ের পর থেকে করে চলেছেন একের পর এক ছবি। 'বোঝে না সে বোঝে না', 'প্রলয়' দুটি ছবিতেই মিমি মন কেড়েছে দর্শকদের। মিমির পছন্দ হীরের গয়না। পুজোয় বা অন্য উৎসবের জন্য এর জুড়ি মেলা ভার।

গয়না ও ছবি : অঞ্জলি জুয়েলার্স, ননি

আমার পুজো

বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটিদের পুজোর কথা

এই পৃথিবীর সকলে তৃপ্ত হোক, বেঁধে থাকুক এক অন্যকে

নবনীতা দেবসেন, লেখক

পুজোর ঢাকে প্রথম কাঠিটা যখন পড়ে, বুকের মধ্যিখানে সীমাহীন আহ্লাদ নিয়ে আজও ঝাঁপিয়ে পড়ে কৈশোর। 'পুজো এসে গেছে'। কে বলেছে বয়েস কেবলই বাড়ে? মাঝে মাঝে বাড়ে, সব সময়ে না। মাঝে মাঝে বয়েসকে ঠকিয়ে দেয় অনুষঙ্গের ম্যাজিক। পাঁচদিন ধরে চলতে থাকে ঢাকের বাদ্যি, তার সঙ্গে ঢাকিদের নাচ। সন্ধিপুজোর বাজনাটা আলাদা। তখন যে আসল ব্যাপারখানা ঘটছে, মা দুর্গা অসুরকে নিধন করে তিন ভুবনকে উদ্ধার করছেন।

ঢাকের বোল অনেক কথাই বলে, কিন্তু আমরা তো তার ভাষা বুঝিনে। আমরা সাধারণ লোকজনেরা জানি কেবল একটাই বোল, একটাই মন্ত্র, যে মন্ত্রের কোনও চ্যালেঞ্জার নেই, যে মন্ত্র কানে নিয়েই আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি। এই নশ্বর ধরিত্রীতে আমাদের জীবনের সব চাওয়া সব পাওয়া, ছোট বড়, দূর নিবিড়, সব সম্পর্কের মূলমন্ত্র এই একটাই। যেটি উচ্চারণ করতে বুক দুরুদুরু করে, বুকে ঢাকের কাঠি পড়ে। এই যে পথ চেয়ে বসেছিলুম, এতদিনে তোর সময় হল, ঘরে এলি, ঘর ভরল, মন ভরল, তো বেশ হল। কিন্তু, এ আসা তো আসা নয়। এ আগমন তো চলে যাওয়ার জন্যই। মা তুই থাকবি কতক্ষণ? ও মা তুই যাবি বিসর্জন!

তর্পণ থেকেই শুরু হয় আমার দুর্গাপুজো। তর্পণের মন্ত্র শুধুমাত্র না আউড়ে গিয়ে আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব, সেখানে বলা আছে, এই পৃথিবীর সকলে তৃপ্ত হোক। সে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, পিতৃপুরুষ সবকিছুই। উৎসব আমাদের সবাইকে বেঁধে থাকার কথা বলে। কাছে আসার কথা বলে।

এই মিলতে চাওয়ার কারণেই পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে যেতে পারি না কোথাও। আত্মজনদের পথ চেয়ে দিন গুণি। এ বছর ইতালিতে আমার লেকচার আছে, সেটা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ওখান থেকে আসব ইলোরাতে আমার বন্ধুর কাছে। ওখান থেকে ঘরে ফেরা অক্টোবরের শুরুতে। ওই সময় কলকাতায় আসছে আমার মেয়ে-জামাই-নাতনি। পুজোর সময় আমার ঘরভর্তি।

বুর্জোয়া মানসিকতা পেরিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসব

শুভাপ্রসন্ন, চিত্রশিল্পী

ছেলেবেলার পুজোর স্বাদ, গন্ধ, পরিবেশ পাল্টে গেছে। হয়তো পাল্টে যায়, আমারা পাল্টে যাই বলে। হয়তো পাল্টে যায়, জীবন পাল্টায় বলে। সমাজ পাল্টায় বলে। স্বাদ পাল্টায় বলে।

আমার জন্ম মধ্য কলকাতায় কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে। জমজমাটি লোকালয়ে। বাড়িটা রক্ষণশীল পরিবার। কিন্তু আমাদের শৈশব-কৈশোরে শারদোৎসব যেন একটা অন্যরকম আনন্দের শিহরণ জাগাত। যখন দেখতাম, হঠাৎ আকাশে খিলখিলিয়ে রোদ, মেঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন এমনিই একটা খুশির ঝলক মনে চলে আসত। ওই রকম আবহাওয়াতে যখন ঢাকের বাদ্যি বাজত, পাড়ায় পাড়ায় ঠাকুর আসতে শুরু করত, কুমোরটুলি থেকে বিশাল বিশাল প্রতিমা কখনও কাঁধে বয়ে নিয়ে আসত বিশেষ ধরনের কুলিরা, কখনও লরিতেও আসত—এসবই আমাদের কাছে ছিল ভীষণ আনন্দের। সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে হাঁটা পথে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে দমকলের পুজোর প্রতি। সেই দমকলের প্রতিমা আসত চতুর্থীর আগের দিন। আমি কোনওরকম বাধা না মেনে ছুটে যেতাম ভোরবেলায়। রমেশ

পালের তৈরি প্রতিমা দেখতে। কী অপূর্ব! প্রতিটি বছর তিনি নতুন ধরনের প্রতিমা তৈরি করতেন। কখনও অসুর যেন দুর্গার কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। কখনও ভয়ঙ্করভাবে মা দুর্গা তাকে নিধনে রত। এখনও দেখতে পাই সেই মাতৃমূর্তি, সেই দেবীরূপ।

পাড়াতে কুলীন বারোয়ারি পুজো হত। মা লালপেড়ে শাড়ি পরে ষষ্ঠী থেকে সেই দশমী পর্যন্ত সকালবেলা প্যান্ডেলে যেতেন। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে। মনে আছে, দশমীর দিন সকালে সাদা কাগজে দুর্গা নাম লিখতাম, কত তাড়াতাড়ি কে কত ছোটো আকারে লিখতে পারে সেই প্রতিযোগিতা হত। কমপক্ষে ১০৮ বার দুর্গা নাম লিখতাম, তারপরে সেই লেখা কাগজ সিঁদুর মাখিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে দিতাম। যখন সিঁদুর খেলা হবে বিকেলবেলায়, সেই সময় মা আমাদের লেখা কাগজ মা দুর্গার পায়ে দেবেন আশীর্বাদ প্রার্থনায়।

জীবনটা সরল ছিল। সাদাসিধে ছিল। সব রঙকে স্বচ্ছতায় দেখতাম। সেই শিশুকাল পেরিয়ে গেল। সংসারের জটিল আবর্তে জড়িয়ে পড়লাম। তারপর অনেক বদল ঘটেছে। একসময় পাড়ার শাসন, পাড়ার রাজনীতি, পাড়ার নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় আমরা সদ্য যুবক। পাড়াতে যেতে ভয় করত। কখনও কখনও দুর্গাপুজোকে যেন বুর্জোয়াদের পুজো, ধর্মপালনকে বুর্জোয়া কাজ, আর বুর্জোয়া মানে বোধহয় কোও পাশব শক্তি— এরকম একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কেউ সাহস করে সন্ধেবেলা পাড়ার উৎসবে যেতে পর্যন্ত পারত না। আর সজোরে কী চিৎকার হিন্দি গানের। তারপর একদিন হঠাৎই আমাদের দেখার পরিবর্তন হল। কোনও এক বাণিজ্যিক সংস্থা ঘোষণা করল, বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে সুস্থ রুচিতে উৎসবকে দেখানোর জন্য, তাহলে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমিও বিচারক হয়ে গেলাম একদিন। শহরের বিভিন্ন মন্ডপে প্রতিমা, তার রূপসজ্জা, আলো, সুস্থ সংস্কৃতি, নান্দনিক উপস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করতে শুরু করলাম। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। তারপর সরকারেরও পরিবর্তন হল। মানুষ এখন অন্যভাবে, অন্য জোয়ারে এই উৎসবকে দেখতে শুরু করেছে। হয়তো আরও রুচির পরিবর্তন হবে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্তন আসে। আমরা চাই আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে ধর্মবোধ, যে বোধ মানুষের কল্যাণে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধে, আত্মীয়তাবোধে সংসারকে আবদ্ধ রাখে, সমাজকে সুন্দর রাখে, তা যেন বজায় থাকে। আমরা যেন উৎসবে রঙিন হয়ে থাকি। সাধারণ দরিদ্র মানুষও যেন দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায়, আনন্দের শরিক হয়। উৎসব এ কথাই বলে।

পুজোর কলকাতা বেস্ট, অঞ্জলি দিই এখনও

পাওলি দাম, অভিনেত্রী

ক্যামেরা রোলিং... স্টার্ট সাউন্ড... অ্যাকশন। প্রায় সারা বছর ধরে কথাগুলো কানের কাছে বেজে চলে। কারণ, এটাই আমার কাজের জগৎ, ভালবাসার জগৎ। কিন্তু পুজোর কটা দিন জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে পরিবারের সঙ্গে, আলসেমির সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। হয়তো বা একটু আহ্লাদের সঙ্গেও। শ্যুটিং থেকে নিজেকে শত হাত দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

বয়স বাড়ে, কাজও বাড়ে। ইচ্ছেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে। যেমন ফুচকা খাওয়ার ইচ্ছে। ছোটবেলার মতো এখনও চুটিয়ে ফুচকা খাই পুজোর দিনগুলোয়, ফিগারের কথা জাস্ট মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়ে। সেই ছোট্টবেলায় বাড়িতে বাইরের বা ফুটপাতের খাবার দাবার নিয়ে বিধিনিষেধ ছিল। মায়ের

চোখরাঙানি ছিল। তবে পুজোর ক-টা দিন ছাড় পেতাম। তখন আমার সে কী আনন্দ! আত্মীয় বা বন্ধুরা যারা বাইরে থাকত তারা কলকাতায় চলে আসত। দেখা-সাক্ষাতের পাশাপাশি আমরা মেতে উঠতাম প্যান্ডেল হপিং-এ। বন্ধুরা মিলে মজা করতাম। এখন সেই ছোটোবেলার পুজোটাকে মিস করি খুব। সে এক অন্য জগৎ ছিল।

পুজোর কলকাতা আমার কাছে এখনও বেস্ট। শুধু বড়বেলাতেই নয়, ছোটবেলাতেও আমরা পুজোর সময় অন্য কোথাও বেড়াতে যেতাম না। এখন শুটিংয়ে প্রয়োজনে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়, বলা যায় সেই সূত্রেই বেড়ানোটা হয়ে যায়। গত বছর শুটিংয়ের জন্য মুম্বই থেকে কলকাতা এসে পৌঁছেছিলাম পঞ্চমীর দিন। উড়ে যেতে হয়েছিল চটজলদি। মুম্বইতেও পুজো হয়, কিন্তু কলকাতার হুল্লোড় তো ওখানে নেই। তাই অতটা ভাল্লাগে না।

আগে আমরা থাকতাম বউবাজারে। তখন স্কুল-কলেজে পড়ি। অষ্টমীতে অঞ্জলি দিতাম। এরপর চলে আসি গলফ গার্ডেনে। চলে আসার পর বউবাজারের পুজো মিস করি খুব। কারণ, ওখানে আমরা থাকতাম মেন রোডের উপর। পুজো না থাকলেও বছরভর একটা হইচই লেগে থাকত। গলফ গার্ডেনের পুজোটা হয় পাড়ার মধ্যে একটা মাঠে। এর ফ্লেভারটা বেশ আলাদা। সেই অর্থে ছোটোবেলায় বউবাজারের হইচই পুজো এবং বড়বেলায় তুলনামূলকভাবে শান্ত পাড়ার পুজো এনজয় করার সুযোগ হয়েছে। এখন পুজোর উদ্বোধনে ফিতে কাটতে যেতে হয়। কিন্তু এখনও অষ্টমীতে অঞ্জলিটা মিস করি না। সাত সকালে উঠে শাড়ি পরে অঞ্জলি আমি দেবই। অঞ্জলি দেওয়ার সময় যে পাওলি হাজির হয় পাড়ার প্যান্ডেলে, সে কিন্তু রুপোলি পর্দার সেলিব্রিটি পাওলি নয়।

আমার মতো নাস্তিকের কাছে পুজো মানে 'লক্ষ্মীলাভ'

রূপঙ্কর, সঙ্গীতশিল্পী

মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই কি আমি বাঙালি? এই শারদীয়া উৎসবকে ঘিরে বঙ্গবাসীর মধ্যে যেভাবে উৎসাহ দেখা যায়, তার ছিটেফোঁটা আমার মধ্যে খুঁজে পাই না বলেই আমার ধারণা। পুজোকে ঘিরে কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা চলে। বিভিন্ন পেশার মানুষ দু-পয়সা বাড়তি রোজগারের সুযোগ পেয়ে থাকেন এই সময়। ভাল কথা, আবার আমার মতো মানুষদের অস্বস্তিতেও পড়তে হয় বই কী!

'পুজোর বেড়ানো' বলে আমার কাছে কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। গত কয়েক বছর ধরে পুজোয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে গান গাইতে যেতে হয়েছে। ওখানে গিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে, চাইলেও ওসব জায়গায় গিয়ে কোথাও কাছে-পিঠে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ হয় না। সঙ্গে আমার বউ চৈতালী বা মেয়ে হয়তো অনেক সময় যায়, কিন্তু আলাদা করে বেড়াতে যেতে পারি না। বিশেষ করে বিদেশে গেলে তো মুশকিলে পড়তে হয় বেশি করে। কারণ, ওসব জায়গায় পুজো মণ্ডপের কাছাকাছি অনেকগুলো শো করার সুযোগ থাকে না সেভাবে। যেসব প্রদেশে পুজো সেই সব জায়গা ঘুরে ঘুরে শো করতে হয়। এক এয়ারপোর্ট থেকে আরেক এয়ারপোর্টে লাগেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আর গান গাইতে গাইতেই সময় যে কখন ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়, বুঝতেই পারি না।

এবার যেমন আমেরিকা যাচ্ছি পুজোর চারদিন আগে। ফেরা সেই লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে। আমাকে যদি মনের সত্যি কথাটা উগরে দিতে হয়, তাহলে সেটা অধিকাংশ বাঙালিরই খুব একটা পছন্দসই হবে না। ছোটবেলা থেকেই দুর্গাপুজোর হই-হুল্লোড় আমার পছন্দ নয়। ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখাটা ছিল তীব্র আপত্তির। বরং ঠাকুমার কোল ছিল আমার নিরাপদ আশ্রয়। সকল গোপন কথা শোনানোর তিনিই ছিলেন আমার ভরসা। পুজোর দিনগুলোতেও বাইরে বেরোতাম না সেভাবে, বরং হাজারো গল্পকথা শোনার জন্য মনটা মুখিয়ে থাকত।

তবে আগে ভাল না লাগলেও এখন পুজো কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগে। তার একটাই কারণ, পুজো মানেই কিছু অর্থ রোজগারের সুযোগ। শারদোৎসবের সৌজন্যে দেশে-বিদেশে প্রচুর পুজো হয়ে থাকে। প্রবাসী বাঙালিরাও অনুষ্ঠানের জন্য আমার মতো কলকাতার বহু শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান। ফলে, আমি যতই নাস্তিক হই আর যতই পুজোর বাহুল্য নিয়ে অ্যালার্জি থাকুক, অর্থকরী দিক দিয়ে আমার কাছে শারদোৎসব মানে লক্ষ্মী লাভ।

কলকাতায় সাবেকি আমেজ প্রায় লুপ্ত

জগন্নাথ বসু, বাচিকশিল্পী

নতুন বড় হওয়া, নতুন জামাকাপড়ের স্বাদ, নতুন জুতোর গন্ধ এবং অবশ্যই পাড়ার পুজো, আমাকে পাগল করে দিত। পুজো এলেই মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি শুরু হয়, তার মাঝে আচম্বিতে সূর্য ওঠে আকাশে, ছড়িয়ে পড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক' অথবা শ্যামল মিত্রের 'নাম রেখেছি বনলতা' আজও শুনলে পুজোর অনুষঙ্গগুলো মনে পড়ে যায়। কারণ, এখনকার মতো তখন বছরভর নতুন গান পাওয়া যেত না। ছিল পুজোর গান। সেগুলোই ফিরে ফিরে শোনা। গুন গুন করে গাইতে গাইতে আত্মস্থ করে ফেলা। এসবই পুজোকে ঘিরে। পুজোতে কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও থাকার কথা ভাবতেও পারতাম না। হয়তো কখনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে থাকতে হয়েছে, কনিতু কলকাতা আমাকে ভীষণভাবে টানত।

পুজোয় বেড়াতে যাওয়াটা আমার কাছে খুব একটা পছন্দের ছিল না কোনও কালেই। যখন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে পুজোর সময় কলকাতা ছাড়তে হয়েছে, তখন বুঝতে পারি কলকাতার পুজোর কী অমোঘ টান! এবছর পুজোর আগে যাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া। তবে চেষ্টা করব পুজোর সবকটা দিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে, অষ্টমী এবং দশমীর দিন তো বটেই। সুযোগ পেলে অষ্টমীর সকালে অঞ্জলিও দেব। এত কিছুর মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। সেই কিন্তুটা এই রকম—যত বয়স বাড়তে লাগল, ততই কেমন যেন প্রাণের শহর কলকাতার পুজোর প্রতি অন্তরের টানটা কমে যেতে লাগল। এখন মনে হয় কলকাতায় না থাকতে পারলেই ভাল হয়। পুজোর সময় যে অসম্ভব ভিড়, পুজোর আয়োজকদের হাভভাব প্রভৃতি আমার যেন কেমন অচেনা লাগে। আমি তো সেই পুরোনো পুজো, সাবেকি পুজোর পরিবেশটা খুঁজতে থাকি। অথচ কী আশ্চর্য, কলকাতায় না পেলেও মুম্বই, পুনা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এমনকী আমেরিকা গিয়েও ফিরে পাই শৈশবের পুজোর স্মৃতি, নিষ্ঠা, আনন্দঘন পরিবেশ। কলকাতার বাইরে সাবেকি পুজোর ঠাঁটবাট এখনও রয়েছে, থিম পুজোর সংক্রমণ ঘটেনি।

কথা লিখন : রমাপদ পাহাড়ি

দৃষ্টিথেরাপি

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

অম্বল, গ্যাস, বুক জ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য এগুলো যেন তনিমার জীবনে ফিক্সড্‌ডিপোজিট। ব্যাঙ্কে ফিক্সড্‌ডিপোজিটে রাখা টাকা যেমন সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পাবেই তেমনিই তনিমার যত বয়স বাড়ছে এগুলো বেড়েই চলেছে। কলেজে পড়ার সময়ে দু-তিনদিন টানা বাইরে খেলেই তনিমাকে নিয়ে মা অসীমাকে ডাক্তারের কাছে যেতেই হত। গ্যাসের ওষুধ, এনজাইম অ্যান্টিবায়োটিক সঙ্গে করে বাড়ি ফেরা। পরের দিকে ডাক্তার আর ওষুধ দিতে চাইতেন না। বলতেন এই অল্প বয়স থেকে এতো ওষুধ খেলে তো এক সময়ে তোমার শরীর ড্রাগরেসিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। তখন আর কোনও ওষুধই কাজ করবে না। তার থেকে বরঞ্চ ফুড হ্যাবিটটা পাল্টাও, দেখবে ভাল আছ।

ব্যাস। তনিমা আর যায় কোথায়। ডাক্তারের নির্দেশ পেয়েই অসীমা মিলিটারি শাসন শুরু করে দিল। ফুচকা, আলুকাবলি, ঘুগনি একদম নয়। তেলেভাজা, সিঙাড়া, চিকেন রোল, চাউমিন খাওয়া তো দূরের কথা, ওদিকে তাকানোই চলবে না। বাড়ি

থেকে টিফিন নিয়ে যেতে শুরু করল তনিমা। মায়ের তৈরি টিফিনে থাকত পাতলা হাতে করা রুটি। সঙ্গে হালুয়া। তাতে ঘিয়ের নামগন্ধ নেই। অসীমা ব্যবহার করতেন সাদা তেল। গলা দিয়ে নিচে নামতে চায় না। তাই খাওয়ার মাঝখানেই দু-তিনবার জলপান। এতে পেট আরও গুড় গুড় করে তনিমার।

অসীমার কাছে এই নিয়ে তনিমার অভিযোগ আসে। প্রতিকার স্বরূপ পাল্টে যায় হাতে করা রুটি আর হালুয়া। তার জায়গায় আসে ফ্যাকফ্যাকে চাউমিন। তাতে থাকে নাম মাত্র পেঁয়াজ। সসের নাম গন্ধ নেই। হাতে করা রুটি আর হালুয়া নয় জল গিলে নিচে নামানো যায়, তাই বলে তো আর চাউমিন ওভাবে খাওয়া যায় না। মাকে অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। রুটি, হালুয়ার জায়গায় ফ্যাকফ্যাকে চাউমিন এসেছে। তা সরে গিয়ে আসবে শুধুমাত্র হলুদ ছোটানো চিঁড়ের পোলাও, নয় তো বেলের মোরব্বা আর থিন অ্যারারুট বিস্কুট। এসব খেয়ে পেট ঠিক রাখা যায়, মন ঠিক রাখা যায় কখনও? আর মন বোধহয় জিভে থাকে।

না হলে পেটের গণ্ডগোলটা ক্রনিক পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরেও সব সময়ে মনের গায়ে জ্বর থাকবে কেন! পেটের গণ্ডগোলটা বাদ দিলে যাতে যাতে মানুষের মন ভাল থাকে সবই তো আছে তার। পেটের গণ্ডগোল থাকলে না কি মাথার চুল পড়ে যায়। তার তো এক মাথা চুল। পেটের গণ্ডগোল থাকলে না কি ত্বক খসখসে হয়ে যায়। কোনও বডি লোশন ব্যবহার না করেও তার স্কিন যা চকচকে মাছি বসলে তা পিছলে পড়ে যায়।

এতো গেল তার শরীরের কথা। কিন্তু শরীরের পরেও একজন মানুষের যা-যা থাকে তা কী তার কম কিছু আছে! ইকনমিক্সে অনার্স করার পরে এম.বি.এ করেছিল। বিদেশি ব্যাঙ্কে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারে ঢুকেছিল পঁচিশ হাজার টাকার মাইনেতে। সেটা অবশ্য বাবার সুপারিশে। তনিমার আইনজীবী বাবার ছোট, বড়, মাঝারি, নানা দরের ক্লায়েন্ট আছে। তারা নানা ধরনের অপরাধ করে বেড়াচ্ছে বা তাদের বিরুদ্ধে অন্য লোকেরা নানা ধরনের অপরাধ, অন্যায় করছে। তা তারাই করুক কী তাদের বিরুদ্ধে অন্য লোকেরাই অন্যায় করুক— সবকিছুর হাত থেকে তাদের নিস্তার দেওয়ার দায়িত্ব তনিমার বাবার। তারা অনেক পয়সা খরচা করেই তনিমার বাবাকে দিয়ে মামলা লড়ায় তবুও সর্বক্ষণ বাবার উদ্দেশ্যে একটা গদগদ ভাব। তনিমা লক্ষ্য করেছে ডাক্তার বা উকিলদের এই এক সুবিধা। গুণেগুণে পয়সা নেব কিন্তু ভাবটা দেখায় যেন দয়া করছি।

তা যাই হোক, বাবার জন্যই তনিমাকে পড়াশোনা শেষ করে বেশি দিন বসে থাকতে হয়নি। তবে বাবা যেখানে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল সেখানেই বসে থাকেনি তনিমা। শুরুর অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে তিনবার কোম্পানি চেঞ্জ করেছে। এখন এক মাল্টিন্যাশনালের অটোমোবাইল উইং-এ বিপণনের শাখার সর্বোচ্চ হয়ে বসে আছে। ব্যবসার কাজ যাতে ঠিকঠাক পরিচালনা করতে পারে তার জন্য অফিস থেকে স্বল্প দূরত্বে দক্ষিণ কলকাতায় হাজার স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট দিয়েছে তার সংস্থা। মা আর বাবা তাই উত্তর কলকাতার সাবেকি বাড়ি ছেড়ে এখন তনিমার ফ্ল্যাটে এসে রয়েছে। বাবা শুধু দুপুরবেলায় পুরনো পাড়ায় যায়। কারণ ওই বাড়িতেই বাবার চেম্বার।

অফিসের গাড়ি তনিমাকে ফ্ল্যাট থেকে অফিসে নিয়ে যায় আবার নিয়ে আসে। ইচ্ছে করলে সেই দামি গাড়িই নয়, এই দামি ফ্ল্যাটও মাইনে থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশের টাকা কাটিয়ে তনিমা নিজের করে নিতে পারে। ব্যাপারটা জানতে পেরে বাবা বলেছিল মাল্টিন্যাশনাল সম্পর্কে নানা জন যে সব মন্দ কথা বলে বেড়ায় তা তো কিছুই মিলছে না রে তোর বেলায়! তখনও তনিমা বাবা-মাকে জানায়নি যে মন ভাল রাখার জন্য, আর মন ভাল থাকলে কাজে আরও মন বসবে তার জন্য, সপরিবারে বছরে একবার বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে সিঙ্গাপুর থেকে তার কোম্পানি তাকে মেল করেছে। মেলের প্রিন্ট আউটটা ফ্ল্যাটে যেদিন নিয়ে এসে বাবাকে দেখাল বাবা তনিমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল তোদের কোম্পানির মালিককে একবার দেখা যায় না? ভগবানকে দেখতে না পাওয়ার আফশোস আমার চলে যাবে।

এরপরেও তনিমার মন ভাল নেই। আর থাকবেই বা কী করে। যার এরকম পেটের অবস্থা তারই অফিস চেম্বারের দীর্ঘ ও চওড়া কাচের জানলার সামনেই ভোজনের স্বর্গরাজ্য। কাচের মধ্যে দিয়ে সব দেখা যায়। কী নেই। তন্দুরি রুটি আর কুলচা বিক্রি করে যে লোকটা তার কাউন্টারের ওপরে বড় বড় স্টিলের ডেকচিতে চানামশালা, পালং পনির, তরকা, কাশ্মীরি আলুরদম রাখা থাকে। ডেকচির ভিতের যতক্ষণ থাকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা, সোয়া একটা বাজলেই হল। এক, দুই, তিন করে করে এক সময়ে জায়গাটা বোলতার চাক হয়ে যায়। লোকটা স্টিলের থালায় রুটি বা কুলচার সঙ্গে ডেকচিতে রাখা নানা পদের কোনও একটা ছোট বাটিতে তুলে খদ্দেরদের দিকে এগিয়ে দেয়।

ওদিক থেকে অনেক কষ্টে চোখ সরিয়ে নেয় তনিমা। তবুও কি রক্ষা আছে। তন্দুরি রুটি, কুলচা সঙ্গে পালং পনির কি কাশ্মীরি আলুরদম সরে গিয়ে দৃশ্যপটে ওই জায়গায় ভেসে ওঠে ওই স্টলের পাশের স্টলের লাল লাল চিকেন ললিপপ, মশালাদার গ্রেভির সেজুয়ান চিকেন সঙ্গে গ্রেভি চাউমিন নয়তো চোখ কামড়ে দেওয়া সস আর ধোঁয়া ওড়া মোমো। আরও কত সব, সাদা দইতে মাখো মাখো দইবড়া, পাপড়ি চাট, সম্বর বড়া, দোসা। পৃথিবীর সমস্ত খাবার স্টল এই রাস্তায়, এই ফুটপাতে। আর এরা সম্ভবত জানে তনিমা পেটের রোগী। তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই ঠিক এই জায়গাটাতেই স্টলগুলি লাগিয়েছে। ওদিকে চোখ গেলেই এমন মনে হয় তনিমার।

ওদিকে চোখ না ফেললেও কি নিস্তার আছে তনিমার। কাজ করতে করতে ওদিকে চোখ চলে গেলে যখন চরম অস্বস্তিতে ভোগে তখন নিজের সিট ছেড়ে উঠে পড়ে। নিজের চেম্বারের সুইং ডোরটা জোরে খোলে আর জোরে বন্ধ করে বাইরের করিডরে বেরিয়ে আসে। রাগত গম্ভীর দৃষ্টি বুলিয়ে দেয় যতগুলো কিউবিকেল দেখা যায় সবগুলোর ওপরেই। প্রতিটি কিউবিকেলের কর্মরত ও রতারা ভয়ে ভয়ে তাকায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তনিমার দিকে। কিন্তু কতটাই বা রাগ বা গাম্ভীর্য দেখাবে তনিমা! এখানেও যে সেই এক দৃশ্য। তার দিকে ভয়ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু মুহূর্ত আগেও খাওয়ায় ব্যস্ত মুখ এখন স্তব্ধ আর সেই স্তব্ধ মুখের চেপে থাকা ঠোঁটের ফাঁক থেকে সসে সিক্ত চাউমিন। ঠোঁটের কোণে হয়তো বা লেগে রয়েছে চিলি চিকেনের গ্রেভি। কোনও হাত মুখ পর্যন্ত উঠে গিয়ে ঠোঁটের গোড়ায় স্ট্যান্ডস্টিল। সেই হাতের আঙুলের ফাঁকে হয়তো আটকে আছে পালং পনিরে ভেজা তন্দুরি রুটির টুকরো। আর সমস্ত অফিস ফ্লোরটা ম-ম করছে নানারকমের খাবারের গন্ধে। তনিমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। এরা কি বাড়ি থেকে বের হয় শুধু খাওয়ার জন্য। অফিসে কি টিফিন করা ছাড়া এদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ঢোঁক গেলে তনিমা। কেউ কোনও কাজ না করলে অফিসটা চলছে কী করে! তারপর রাগের মুখটা অন্যদিকে ঘুরে যায়। টিফিনের সময়ে টিফিন করবে এ নয় ঠিক আছে। তাই বলে রোজ রোজ সুস্বাদু খাবার সহযোগে টিফিন করার কী আছে! এদের কি পেটটেট খারাপ হয় না! নাকি স্টম্যাক নাইলনের! সিন্থেটিক জিনিস দিয়ে তৈরি

বলেই হয়তো খারাপ হয় না।

আজও রাগতো মেজাজ নিয়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছিল তনিমা। আর এই রাগ কারও ওপরে দেখাতে পারে না বলে করিডর ধরে সোজা চলে যায় বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে স্বল্প পরিসরের লাউঞ্জটাতে। এই জায়গাটাতে ব্রাঞ্চের কিছু ছেলেমেয়ে সিগারেট খেতে আসে। কারও পরিচিত কেউ এলে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসে। জায়গাটাতে এসে এলোমেলো একটু পায়চারি করে রাগ কমিয়ে নিজের চেম্বারে ফিরে যায় তনিমা।

আজও তেমনই ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে হাসি নয়। তবে হাসির মতো কিছু একটা। আর সেটা যাই হোক না কেন তারই উদ্দেশ্যে। ভিজিটার্স লাউঞ্জে কোণের দিকে দুটো সোফা রাখা আছে। তার সামনে ছোট একটা কাচের টি-টেবিল। তার ওপরে একটা টিফিনবক্স খোলা। ছেলেটা মনে হয় টিফিন করছে। তা করুক। তাতে তনিমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার দিকে অমন করে তাকানোর কী মানে! তাকানোটা নিয়ে তনিমার মধ্যে যতই আপত্তি, যতই অস্বস্তি থাকুক না কেন বুকের মাঝখানটায় কীরকম করে উঠল। চোখ সরিয়ে নিয়েছিল তনিমা। কিন্তু ভয়ে ভয়ে আবার তাকাল। সেই একই রকমের চাহনি। দৃষ্টি সরিয়ে দ্রুত জায়গাটা থেকে সরে এল।

নিজের চেম্বারে এসে কাজে মন বসানোর চেষ্টা করল তনিমা। কিন্তু পারল না। বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউতে নদীপাড়ের নরম মাটি ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে। যত ঢেউটা আটকানোর চেষ্টা করছে তবু তাই এসে ধাক্কা মারছে পাড়ের গায়। আচ্ছা এর আগে কি কোনও ছেলে তার দিকে তাকিয়েছে এমন চোখে? কই মনে পড়ছে না তো।

আর মনে পড়বেই বা কী করে। ছেলেদের মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকানো তো সে শুরু করেছে চাকরি পাওয়ার পর থেকে। তার আগে কে তার দিকে তাকিয়েছে, কী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে সে জানবে কী করে। তার আগে সে বইয়ের ছাপা অক্ষরের দিকে আর ছাপা অক্ষর তার দিকে— দৃষ্টি বিনিময় বলতে তো এই শুধু। শুধু পড়া, পড়া আর পড়া। দিন জেগে পড়া, রাত জেগে পড়া। অনেকেই পড়ুয়া হয়, কিন্তু তনিমার কাছে পড়াশোনাটা ছিল নেশা। প্রথম প্রথম পেটের সমস্যাটার জন্য যে ডাক্তারের কাছে গেছে তিনিই বলেছেন রাত জেগে পড়াটা এর প্রধান কারণ।

তা যাই হোক পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে ঢোকার পর থেকে একটু বাঁদিকে ডানদিকে তাকানোর অভ্যাস হয়েছে তনিমার। কিন্তু এতে তার উৎসাহ বাড়েনি। বরঞ্চ হতাশাই একটু বেড়েছে। লক্ষ্য করেছে কোনও পুরুষ চোখ থেকেই তার উদ্দেশ্যে কোনও কৌতূহল, কোনও উৎসাহ ভেসে আসে না। কলেজের বান্ধবী শ্রীলেখাদের বাড়িতে একবার বুদ্ধপূর্ণিমার পুজোয় গিয়েছিল। ওর এক পিসতুতো দাদাকে বেশ পছন্দ হয়েছিল তনিমার। লজ্জার মাথা খেয়ে ফেলে শ্রীলেখাকে সেকথা বলেওছিল। পরে শ্রীলেখা বলেছিল আমার দাদা বলেছে ওরকম ডিকশনারির মতো মুখ আমার চলবে না।

—মানে!

—মানে আমার দাদা বলেছে ওর মুখের দিকে তাকালে একটা ভারী বই আমি দেখে ফেলি, আর ওর চোখ মুখ ঠোঁট— সব যেন ছাপা অক্ষর।

রাগে অপমানে ক্ষোভে মোবাইলটা অফ করে দিয়েছিল তনিমা। তবে ঠিক রাগে অপমানে ক্ষোভে নয়। তনিমার বেশ মনে আছে শ্রীলেখা ওর দাদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখে ফেলে জানানোর পরেই পেট কুঁই কুঁই করে ওঠে। কী যেন একটা কাজে যাচ্ছিল তনিমা। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। বাড়ি ফিরে এক দৌড়ে সোজা বাথরুমে।

কিন্তু আজ কী এমন ঘটালো যে যা হাপিত্যেশ করে গত কয়েক বছর ধরে খুঁজছে তার দেখা পেয়ে গেল হঠাৎ করে! নিজের চেম্বারে ঢুকে কাজে মন বসিয়েছে ঠিকই কিন্তু তনিমার মনের স্ক্রিনে ছেলেটার মুখ ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। সুঠাম চেহারা ব্যাকব্রাশ করা চুল। তবে চুলে তেল একটু বেশিই দিয়েছে। তারই জন্য বোধহয়, অ্যাপিলটা একটু বোকাবোকা। কিন্তু এসব কিছু যাইহোক। দৃষ্টিটা? কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। কীরকম লজ্জাঘন মোহময় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল! ধ্যুৎ কাজ। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল তনিমা।

চেম্বার থেকে বাইরের করিডরে এসে দেখল প্রায় সমস্ত অফিস যে যার কিউবিকেলে এখনও টিফিন করতে ব্যস্ত। গুটিগুটি পায়ে চলে এলো ভিজিটার্স লাউঞ্জে। মাথা নিচু করে এক মনে টিফিন করছে। দেখতে পায়নি তনিমাকে। তনিমা ইচ্ছে করেই জুতোয় সামান্য শব্দ তুলে এগিয়ে গেল যেদিকে গাড়িগুলো পার্ক করা থাকে সেদিকটায়। আবার ফিরে এল এদিকে। এবার ছেলেটার দৃষ্টিতে পড়েছে। সেই চাউনি। খাওয়া থামিয়ে দিয়ে ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। একগাল হেসে বলল, কাউকে খুঁজছেন ম্যাডাম?

—না, তুমি কি আমাদের অফিসের?

—হ্যাঁ ম্যাম্, লাস্ট মানথে অ্যাকউন্টসে জয়েন করেছি...

—তাই কীরকম চেনাচেনা লাগছে

—আপনিই তো আমার ইন্টারভিউ নিয়ে ছিলেন, সোমনাথ বোস...

—তাই! দেখেছো কীরকম ভুলে যাই, এত কাজের চাপ না, মাথায় কিছু থাকছে না...

—ম্যাডাম টিফিন হয়ে গেছে...

একটা ক্ষীণ অস্বস্তি নিয়ে তনিমা বলল, না।

—খাবেন? সামনের ছোট টেবিলটার ওপরে খুলে রাখা টিফিনবক্সটা চোখের দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করল।

তনিমা ছেলেটার সাহস-সপ্রতিভ ব্যবহারের তারিফ করল মনে মনে। এই অনুরোধ এই ব্রাঞ্চে তাকে করার সাহস কেউ পায় না। মনে হয় তেল দেওয়ার জন্যই করে ফেলেছে। পরে বুঝবে। আজকাল তো এমন হয়েছে তনিমাও জানে না আধঘণ্টা পরে তনিমা কী করে বসবে।

তবুও সোমনাথের দিকে এগিয়ে গেল তনিমা। ছেলেটার দৃষ্টিতে কী যেন একটা আছে। অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। সামনে গিয়ে দেখল খোলা টিফিন বক্সে আলু আর এঁচোড়ের তরকারি। হাতে করা রুটি। সোমনাথ এক গাল হেসে বলল, মায়ের তৈরি করা।

খোলা টিফিনবক্সের দিকে আবার তাকাল তনিমা। বলছে বাড়ির তৈরি করা কিন্তু তেল-মশলায় যা রঙ হয়েছে তাতে দোকানকেও হার মানাবে। বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। সোমনাথ জানে তার পেটের অবস্থা কী! ভাবল কথাটা ওকে বলবে। কিন্তু বলতে পারল না। ওর দৃষ্টির মতোই ওই তরকারি তনিমাকে টানছে। কিন্তু ভিজিটার্স লাউঞ্জে বসে তার এক জুনিয়রের সঙ্গে তার টিফিন করাটা মানায় না। ব্রাঞ্চের কেউ দেখলে সে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। তনিমা তাই মিষ্টি হেসে বলল, তুমি ওপরের কনফারেন্স রুমে গিয়ে বসবে? আমার দুটো চিঠিতে সাইন করার আছে...

—হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু কনফারেন্স রুম কি খোলা আছে?

—খোলা না থাকলে বেয়ারাকে বলবে যে আমি তোমাকে বলেছি কনফারেন্স রুমে আসতে আর শোনো টিফিন বক্সটা প্লাস্টিকে ভরে নাও...

যে প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে করে টিফিনবক্সটা এনেছে সোমনাথ তার ভেতরেই আবার ঢুকিয়ে ফেলল।

হাল্কা একটা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে ভেতর দিকে চলে গেল তনিমা।

চেম্বারে গিয়ে কোনও চিঠিতে সই করল না তনিমা। শুধুমাত্র টেবিলের ওপরে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা কাগজগুলো গোছগাছ করে চলে এল ওপরের কনফারেন্স রুমে।

সোমনাথ ওর টিফিন, টিফিনবক্স আর টিফিনবক্সের ঢাকনায় দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। একটা এগিয়ে দিল তনিমার দিকে। তনিমার চোখে তরকারির রঙ ঘুষি মারল। কিন্তু সোমনাথের চোখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তেই মুছে গেল ঘুষির আঘাত। এক টুকরো রুটি তরকারিতে মাখিয়ে বেপরোয়াভাবে মুখে পুড়ে দিল তনিমা।

আর প্রথম কামড় দিতেই তনিমার ব্রহ্মতালু কেঁপে গেল। বাড়িতে তিন-চার পদ হলে একটা বা দুটো লঙ্কার বাটা দিয়েই সবকটা রান্না মা করে। তার তুলনায় এই রান্নাতে তারা পনেরো দিনে রান্নায় যা ঝাল দেয় তার পুরোটাই মনে হয় আছে।

ঝালের চোটে কেশে ফেলল তনিমা। ওর মুখ থেকে এক, দু' টুকরো রুটি ছিটকে এসে পড়ল সোমনাথের গায়। তেল দিতে গিয়ে এসে কী অঘটন ঘটিয়ে বসল! জলের বোতলের ছিপি খুলে তড়িঘড়ি এগিয়ে ধরল তনিমার সামনে।

আলগোছে না খাওয়ার মতোই জল খেল তনিমা। ঝাল লাগার কথাটা চেপে গিয়ে সলজ্জ হেসে বলল, বিষম লেগে গিয়েছিল...

—তাও ভাল...

সোমনাথ তার জুনিয়র। সে ব্রাঞ্চের সর্বেসর্বা। তাই এই মুহূর্তে কিছুতেই হেরে যাওয়া চলে না। বিষম লেগেছে একবার বলে নিয়েছে। ফলে ঝাল লাগলে জল খাবে কিন্তু এই রুটি-তরকারি

সোমনাথের দৃষ্টি আর ওর নানা ধরনের টুকরোটাকরা কথার মধ্যে দিয়ে এক টুকরো, দু' টুকরো করে দুটো রুটি আর বেশ কিছুটা এঁচোড়ের তরকারি। এঁটো হাত বেসিনে ধুতে ধুতে বেশ চমকে গেল তনিমা। যতই সাহস দেখিয়ে নিয়ম ভেঙে খাক না কেন অবচেতনে একটা ভয় বারবার বুকের দরজায় টোকা মারছিল।

ছাড়া চলবে না। আবার রুটির টুকরো ছিঁড়ে এঁচোড়ের তরকারিতে মাখিয়ে মুখে দিল তনিমা।

সোমনাথ একটা প্রবল কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। মনে হয় একটা উইকেট পড়েছে। আবার পরের বলেই কি একটা উইকেট পড়বে!

পড়ল না। এবার তনিমাও অবাক। একটুও ঝাল লাগল না। উত্তেজনায় মুখের খাবার শেষ হওয়ার আগেই আবার একটু রুটি ছিঁড়ে এঁচোড়ের তরকারি সমেত মুখে প্রবেশ করিয়ে দিল তনিমা। চিবলো, গিলল, কোনও অসুবিধা হল না।

দেখল সেই মোহ মাখানো দৃষ্টিতে তাকে দেখছে সোমনাথ। তনিমা বেশ লজ্জা পেয়ে কথা ঘোরানোর মতো ওর দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য বলল, বাই দ্য বাই তুমি নিজের সিটে না করে ভিজিটার্স লাউঞ্জে গিয়ে টিফিন করো কেন!

—সবাই তো প্রায় বাইরে থেকে আনানো খাবারে টিফিন করে, আমার দিকে, আমার টিফিনবক্সের দিকে কেমন করে যেন তাকায় আমার ভাল লাগে না...

ও। মনে মনে তনিমা বলল, তা তাকাক। ওদের এই তাকানোটা বেশ ভাল ব্যাপার। ওরা যদি সোমনাথের দিকে ওভাবে না তাকাতো তাহলে তো সোমনাথ টিফিন করার জন্য ভিজিটার্স লাউঞ্জে আসত না। আর না এলে ওর সঙ্গে এমন সুন্দর একটা সাক্ষাৎ ঘটতো কি?

সোমনাথের দৃষ্টি আর ওর নানা ধরনের টুকরোটাকরা কথার মধ্যে দিয়ে এক টুকরো, দু' টুকরো করে দুটো রুটি আর বেশ কিছুটা এঁচোড়ের তরকারি। এঁটো হাত বেসিনে ধুতে ধুতে বেশ চমকে গেল তনিমা। যতই সাহস দেখিয়ে নিয়ম ভেঙে খাক না কেন অবচেতনে একটা ভয় বারবার বুকের দরজায় টোকা মারছিল। এই বোধহয় খাওয়া শেষ হলেই বাথরুমে ছুটতে হবে। অথচ সেরকম কোনও প্রয়োজন অনুভব করলো না তনিমা।

রুমালে মুখ মুছে সোমনাথের সামনে ফিরে এসে বলল, আমি যাই অনেক কাজ আছে...

সোমনাথ একেবারে গদগদ। তার টিফিন থেকে টিফিন করেছে ব্রাঞ্চের সর্বেসর্বা। আর কী চাই তার! বাচ্চা-ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল। মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন।

কয়েক সেকেন্ডও হয়নি। কনফারেন্স রুমে ফিরে এল তনিমা। এঁটো টিফিনবক্স গোছাচ্ছিল সোমনাথ। অবাক হয়ে তাকাল। তনিমা হেসে বলল, কাল আনছো তো...

—কী?

—টিফিন...

—হ্যাঁ, আনবো না কেন!

—না, না, তা বলছি না, আমার জন্যে থাকছে তো?

—হ্যাঁ, এবার থেকে মাকে বলবো দুটো করে রুটি বেশি দিতে...

—দ্যাটস্ রাইট...। উচ্ছল হাসিতে বাতাস ভরিয়ে দিয়ে চলে গেল তনিমা।

অফিস থেকে ফিরে দুটো ব্যাগই বসার ঘরের সোফায় ছুড়ে দিয়ে বাথরুমে চলে যায় তনিমা। আজও চলে গিয়েছিল। বেরিয়ে মায়ের অবাক মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তনিমার ব্যাগ খুলে অসীমা প্রতিদিন টিফিনবক্স বের করে নেন ধোবেন বলে। আজকের টিফিনবক্স খুলে তিনি তো হাঁ। সকালে ভরে দেওয়া চাউমিন যেমন কে তেমন ভরা রয়েছে। এক চামচও খায়নি। অসীমা কিছু বলার আগেই তনিমা বলে উঠল, আজ যা কাজের চাপ ছিল টিফিন করবো কী! ব্যাগ থেকে টিফিনবক্স বের করতেই ভুলে গিয়েছিলাম।...

—তাই বলে সারাদিন না খেয়ে অফিস করে গেলি!

—কী করবো...। তনিমা কপট রাগ দেখিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল।

অসীমা চলে যাচ্ছিলেন রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছনে ফিরে বললেন, এ্যাই শোন...

তনিমাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী...

— বলছি তোকে দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না...

—কী মনে হচ্ছে না...

—সারাদিন খাসনি বলে তো মনে হচ্ছে না, সারাদিন না খেয়ে থাকলে মুখ কীরকম শুকিয়ে যায়, তোকে তো বেশ ফ্রেশ লাগছে, অন্যদিনের থেকে বেশি ফ্রেশ লাগছে...

—তাই! তাহলে এবার থেকে দুপুরে আর টিফিন করবো না, টিফিন না করলে যদি বেশি ফ্রেশ হওয়া যায় তবে সেটাই বেটার না কি...

অসীমা এক মুখ রাগ নিয়ে দপদপানো পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

সেদিন ছিল রুটি আর এঁচোড়ের তরকারি। তারপর এক একদিন নানারকম খাবার এসেছে। আজ পরোটা আর ধোকার ডালনা। তার রঙ দেখে জিভে নয় তনিমার সমস্ত মনোজগতে জল গড়াতে থাকল। কিন্তু পরক্ষণেই মন তনিমাকে বলে উঠল একটু রিস্ক নেওয়া হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু টিফিনবক্সের দিক থেকে চোখ তুলতে দেখতে পেল সোমনাথ তাকে দেখছে। গত কয়েকদিনের থেকে আজ দৃষ্টির ঘনত্ব অনেক বেশি। কাল ডিভিডিতে ‘বরফি’ দেখছিল। রণবীর কাপুরের প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার প্রতি দৃষ্টিটা ঠিক এরকমই তো ছিল। মন তনিমাকে রিস্ক নেওয়া সম্বন্ধে কী সাবধানবাণী শুনিয়েছিল বেমালুম ভুলে গেল তনিমা। রুটিতে ধোঁকার ডালনার টুকরো ভেঙে মুড়িয়ে মুখে পুড়ে দিল।

চিবোতে চিবোতে তনিমা বলল, আমার খুব লজ্জা করে, তোমার টিফিনে রোজ ভাগ বসাই, আমি কিছু খাওয়াতে পারি না...। তারপর ম্লান হেসে বলল, কী করে খাওয়াবো বলো, আমি যা টিফিন আনি সে তো হাসপাতালের ডায়েট...

—কেন!

—আমার পেটে তো কিছুই সহ্য হয় না...

—ও মা তাই! তাহলে এ কদিন যে আমার টিফিন থেকে টিফিন করছেন, নিশ্চই খুব প্রবলেমে পড়ছেন...

তনিমা বলে উঠল, একেবারেই নয়...

—মানে!

—কী জানি, তোমার টিফিন খাওয়া শুরু করার পর যখন দেখলাম কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, একদিন সাহস করে একা বাইরের খাবার খেলাম, ও মা সেদিন ঠিক প্রবলেম হল, তারপরে আবার তোমার টিফিন খেলাম কিন্তু কোনও প্রবলেম হল না...

—ও মা সে কী!

—আমিও খুব অবাক হয়েছি, ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পায়নি...

দুজনেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকল। রুটি দিয়ে ধোঁকার ডালনা খেতে থাকল।

মায়ের কাছ থেকে বাঁচার জন্য বাড়ি থেকে আনা টিফিন অফিসের প্যানে বিসর্জন দেয় তনিমা। তারপরে ফ্লাশ করে দেয়। আজ সোমনাথের সঙ্গে কথপোকথন, সোমনাথের মোহ জড়ানো তাকানোয় ওই কাজটা করতে ভুলিয়ে দিয়েছিল তনিমাকে। তাই তনিমার অফিস ফেরত টিফিনবক্স খুলে মাথায় রক্ত চড়ে গেল অসীমার। চিৎকার করে বলে উঠল, কী শুরু করেছিস তুই! সেদিনও দেখলাম টিফিনের জন্য দেওয়া চাউমিন যেমন কে তেমন রয়ে গেছে, আজ চিঁড়ের পোলাও তেমনই রয়ে গেছে! এভাবে টিফিন করা বন্ধ করে দিচ্ছিস কেন!

তনিমা ঠিক করল ঘটনা মায়ের কাছ থেকে আড়াল করবে না। আর কতদিনই বা করতে পারবে। তার থেকে বলে দেওয়াই ভাল। সব কথা বলে দিল মাকে।

সব শুনে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল অসীমা। হাঁ হয়ে বললেন, এসব জিনিস তুই খাচ্ছিস! অথচ লক্ষ্য করছি না তোকে কোনও প্রবলেমে পড়তে! এটা সম্ভব হচ্ছে কী করে!

তনিমা কোনও উত্তর দিচ্ছে না। মৃদুমৃদু হাসছে।

অসীমা বলল, ওষুধের ডোজ কি বাড়িয়ে দিয়েছিস?

— যাও আমার আলমারির ড্রয়ার খুলে দেখো, বুঝতে পারবে ডোজ বাড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা এক সপ্তাহ হল আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

—কী বলছিস কী।

হাসতে থাকে তনিমা।

অসীমা অবাক হয়ে বলে, এটা সম্ভব হচ্ছে কী করে!

—বললাম না সোমনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে খেলে আমার সব হজম হয়ে যায়...

—সোমনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে খেলে তোর সব হজম হয়ে যায়! এ আবার কীরকম থেরাপি! অ্যালাপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আকুপাংচার তারপর যোগথেরাপি, তারপর আরও কতরকমের শুনেছি, কিন্তু এরকম তো কোনওদিন শুনিনি...

তনিমা হেসে বলল, এর নাম দৃষ্টিথেরাপি মা...

—দৃষ্টিথেরাপি!

—হ্যাঁ...

—তা যাই হোক, ওর চোখের দিতে তাকিয়েই খাস, যাতে ভাল থাকিস শুধু তাই চাই...। বিড়বিড় করতে করতে দুই করতল জোড়া করে কপালে ঠেকালেন অসীমা।

এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি আধুনিক মনস্ক। পড়াশোনাও তাদের যথেষ্ট। ইন্টারনেটের দৌলতে জীবনের অনেককিছু সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়ের পর অনেক সময়ই তারা সুখি হতে পারছে না। ছ মাস কাটতে না কাটতেই ডিভোর্স-এর মাধ্যমে রেহাই পেতে চাইছেন একে অন্যের থেকে। এর কারণ কী? বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন কী কী করণীয়? বিয়ের আগে থেকে কি কোনও প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে? মনের মধ্যে উঁকি দেওয়া অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডা. মালা বসু**

বিয়ে সুখের হয় সঠিক মিলনের গুণে

প্রশ্ন : বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে ঠিক মতো প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : অবশ্যই সেক্স বা যৌন সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর হয়ে উঠতে সাহায্য করে দুজনের ফিজিকাল রিলেশনশিপ (দৈহিক মিলন)। যৌন সম্পর্ক যদি তৃপ্তি দায়ক হয় তাহলে একজন অপরজনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্কও মধুর হয়ে ওঠে। আর যখন তা হয় না তখনই ঘটে সম্পর্কের অবনতি। অনেক সময় দুজনেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ডিভোর্স-এর মাধ্যমে। বিবাহিত জীবনে 'সেক্স'-এর ভূমিকা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট।

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক সুস্থভাবে গড়ে না ওঠার জন্য মূলত দায়ী কে স্বামী না স্ত্রী?

উত্তর : স্বামী কিংবা স্ত্রী দুজনেরই কিছু কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সুস্থ যৌন জীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দুজনের যে সাধারণ সমস্যা এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য দায়ী তা হল মানসিক সমস্যা। একের অন্যকে পছন্দ না হওয়া, নিজের ভালবাসার মানুষটির থেকে বিচ্ছেদ হয়ে অন্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়া কিংবা নিজের অমতে বাড়ির লোকেদের জোরাজুরিতে বিয়ে হওয়া। এরকম অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কেউই অন্যজনকে মেনে নিতে পারে না। আর মন থেকে না মানার জন্য যৌন মিলনে তৃপ্তি আসে না। আসলে দম্পতিদের দুজনের যে কোনও একজন বা দুজনই যদি মানসিকভাবে আপসেট থাকে তাহলে ব্রেন থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয়ে যৌন সুখ ও আনন্দ দেয় সেই হরমোন ঠিকমতো বেরয় না। ফলে সহবাস দুজনের কাছেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

ছেলেদের কিছু শারীরিক সমস্যাও সহবাস ঠিকমতো না হওয়ার জন্য দায়ী। যেমন, ভাইরাল কিংবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থাকলে ইন্টারাকোর্সের সময় খুব ব্যথা লাগে। স্বাভাবিকভাবেই তখন এর থেকে দূরে থাকতে চায় মানুষ। কিছু ছেলের যৌনাঙ্গের স্টিফনেস আসে না বলে পেনিট্রেশন ঠিকমতো হয় না। ফাইমোসিস থাকলেও পেনফুল ইন্টারকোর্স হয়। ফলে যৌন সংসর্গে কোনও তৃপ্তি আসে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছেই তখন সহবাস অসহ্য লাগে। সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয় কখনও কখনও এখান থেকেই।

প্রশ্ন : মহিলাদেরও কী কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে যা দাম্পত্য জীবনের অন্তরায় হয়ে ওঠে?

উত্তর : কিছু শারীরিক সমস্যা মেয়েদেরও থাকে, যার জন্য সহবাস ঠিকমতো হয় না। বিশেষ করে ভ্যাজাইনায় ভাইরাল কিংবা ব্যাকটেরিয়াল কোনও ইনফেকশন। হোয়াইট ডিসচার্জ মেয়েদের খুব কমন সমস্যা, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দু ধরণের জীবাণুই এর জন্য দায়ী হতে পারে। যে কারণেই হোক না কেন, ইনফেকশন যদি থাকে তাহলে জ্বালাভাব, ব্যথা ইত্যাদি হয়। এই অবস্থায় ইন্টারকোর্স করলে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। ফলে মহিলারা বিষয়টি এড়িয়ে চলতে চায়, একান্তই তা সম্ভব না হলে দায়সারাভাবে পারফর্ম করে।

মেয়েদের ভ্যাজাইনাতে যদি হারপিস জস্টার ইনফেকশন, জেনিটাল ওয়ার্ট, কোনওরকম আলসার কিংবা সিফিলিস থাকে তাহলেও শারীরিক মিলন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। কোনওরকম আনন্দই তাঁরা পায় না। এছাড়া এর জন্য আধুনিক লাইফ স্টাইলও কিছুটা দায়ী।

প্রশ্ন : লাইফস্টাইল দায়ী বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আজকাল বহু ছেলেমেয়ে আইটি সেক্টরে কাজ করছে। যেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২-১৪ ঘণ্টা সময় কাটাতে হয় বাড়ির বাইরে। বাড়ি ফিরেও অফিস সংক্রান্ত কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত

থাকে। ফলে তারা এত বেশি ক্লান্ত থাকে যে কিছুই ভাল লাগে না। 'সেক্স' যে জীবনের একটা অংশ তা ভুলে যায়। ফলে স্বামী-স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে থাকে। আর তার চূড়ান্ত পরিণতি হল ডিভোর্স।

প্রশ্ন : নব বিবাহিতদেরও কি এমন সমস্যা হয় যে সেক্স ডিজায়ারটাই থাকে না?

উত্তর : নববিবাহিতদেরও এটা হতেই পারে। নতুন দম্পতিদের সাধারণত ঘন ঘন মিলন হয়। যেহেতু চাহিদা সবার সমান থাকে না, কারও কম কারও বেশি তাই দুজনের চাহিদার মিলমিশ না হলেই সমস্যা হয়।

প্রশ্ন : বিয়ের পরপরই প্রেগন্যান্সি যাতে না আসে তার জন্য কী করণীয়?

উত্তর : বিয়ের আগে থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। অনেক সময়েই স্বামী এবং স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করতে একটু সময় লেগে যায়। কেউই হয়তো প্রথমেই প্রেগন্যান্সি চায় না। যদি তেমন সম্ভাবনা এসে যায় এই কারণে দুজনেই মানসিক দ্বিধা কাটিয়ে মেলামেশা করতে চায় না। ফলে তাদের মিলনেও তৃপ্তি আসে না। অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করার ফলেও অনেক সময় যৌন সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয়। এইসব পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য বিয়ের আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। জেনে নেওয়া দরকার কন্ট্রাসেপটিভ পদ্ধতি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম কানুন।

প্রশ্ন : কনট্রাসেপশন-এর জন্য তো এমার্জেন্সি পিল আছে। খেলেই হল। সমস্যা কোথায়?

উত্তর : 'এমার্জেন্সি কনট্রাসেপশন' নামের মধ্যেই আছে যে এটা একেবারে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা উচিত। বছরে এক-আধবার চলতে পারে। নিয়মিত কখনওই খাওয়া চলবে না। তাহলে মাঝে মধ্যেই ব্লিডিং হওয়া থেকে দেখা দিতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য তাই বিয়ের আগে থেকে জেনে নিতে হবে, কবে থেকে পিল খেতে হবে। নয়তো একদিনের অসাবধানের মিলন থেকেই প্রেগন্যান্সি এসে যেতে পারে। ছেলেদের কন্ডোম ব্যবহার একটা ভাল উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণের। আর আছে রিং-এর ব্যবহার।

প্রশ্ন : পিল খাওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : কন্ট্রাসেপটিভ পিলগুলো সাধারণত দুধরনের স্ট্রিপে পাওয়া যায়। কিছু পিল খেতে হয় ২১ দিন। কিছু পিল ২৮ দিন। পিল খেতে হবে পিরিয়ড শুরুর প্রথম দিন থেকেই। বিয়ের কমপক্ষে একমাস আগে থেকে পিল খেলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রশ্ন : আজকাল তো অনেক সময়ই ৩০ বছরের পর বিয়ে হচ্ছে। তাদের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদ্ধতি উপযুক্ত?

উত্তর : ৩০ বছর বয়সের পর বিয়ে হলে কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সন্তান নিয়ে তারপর চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে তার জন্য উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রক পদ্ধতি জেনে নিতে হবে। কারণ প্রতিটা মেয়েই নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিম্বাণু বা ওভাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রতিমাসে পিরিয়ডের সময় এক আধটা নয় বেশ কিছু ওভাম নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বয়স যত বাড়ে ওভামের সংখ্যা তত কমতে থাকে। যখন সব ওভাম নষ্ট হয়ে যায় তখনই দেখা দেয় মেনোপজ। কাজেই ওভামের সংখ্যা বেশি থাকতে থাকতেই সন্তান নিয়ে নেওয়া ভাল।

এছাড়া বেশি বয়সে সন্তান হলে তাদের মেন্টাল রিটার্ডেশন, ডাউন্স সিনড্রোম ইত্যাদি অসুখের আশঙ্কা বাড়ে। এখন যদিও গর্ভ ধারণের ১১-১৩ সপ্তাহের মধ্যেই রক্তের একটা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে ডাউন্স সিনড্রোম নির্ধারণ করা যাচ্ছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টিই না হয় তার জন্য প্রথম থেকেই সতর্ক থাকা ভাল। তাই ৩০ বছর বয়সের পর বিয়ে হলে একটা সন্তান না হওয়া পর্যন্ত কোনও কন্ট্রাসেপশন নয়।

প্রশ্ন : কীভাবে সমস্ত সমস্যা সরিয়ে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব?

উত্তর : প্রথমেই বলি, শারীরিক সমস্যার কথা। স্বামী কিংবা স্ত্রী কারও কোনও শারীরিক অসুবিধা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করাতে হবে। মানসিক সমস্যা হলে দুজনের একসঙ্গে কাউন্সিলরের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং করানো উচিত। তবে আমি বলব, বিয়ের আগে সবচেয়ে জরুরি হল ব্লাড গ্রুপিং করানো। থ্যালাসেমিয়া টেস্ট অবশ্যই করানো দরকার। এছাড়াও আজকাল থাইরয়েড রোগীর সংখ্যা প্রচুর বাড়ছে। বিয়ের আগে থাইরয়েড সমস্যা আছে কিনা জেনে চিকিৎসা শুরু করা দরকার। থাইরয়েড থাকলে প্রেগন্যান্সিতে সমস্যা হয়। থাইরক্সিন হরমোন বাচ্চার মেন্টাল ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে। কাজেই আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

জেনে রাখুন

- বিবাহিত জীবনে যৌনসুখকে সেকেন্ডারি বিষয় বলে মনে করবেন না।
- সেক্স-এর প্লেজার বা আনন্দ না পেলে স্বামী-স্ত্রী সরাসরি কথা বলুন। প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করান।
- বিয়ের পরেই প্রেগন্যান্সি না চাইলে আগে ভাগেই কন্ট্রাসেপশন-এর ব্যবস্থা করুন। এতে দুজনেই টেনশনমুক্ত থাকতে পারবেন।
- বিয়ে ঠিক হওয়ার পর অবশ্যই পাত্র-পাত্রী দুজনের থ্যালাসেমিয়া ও এইচ আই ভি টেস্ট করাবেন।
- সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে দুজন দুজনের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে নেবেন।
- সারাদিন অফিসের কাজের চাপে ক্লান্ত থাকলে তখন সেক্স অ্যাভয়েড করুন। নয়তো তৃপ্তি তো আসবেই না, বরং বিরক্তি লাগবে। রিল্যাক্সড অবস্থাতেই শারীরিক মিলন কাম্য।

ডাক্তারের চেম্বারে

উত্তর কলকাতায় প্রথম কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত

লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান

মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag
SANJEEVANI
MULTISPECIALITY HOSPITAL
ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

ভালবাসার ফুল

অনুপ ঘোষাল

আমি সুমনা। শিক্ষিকা। স্বামী প্রীতম নামী ডাক্তার। রমরমা প্র্যাকটিস। চাকরিও করে সরকারি হাসপাতালে। একমাত্র ছেলে ঋতম। বছর দশেকের। ব্রিলিয়ান্ট। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে চান্স পেয়েছে এ বছর। আবাসিক ছাত্র। ক্লাস ফোর।

আপাত চোখে সুখি সংসার। আমাদের স্বাচ্ছল্য, ছেলের সাফল্য দেখে প্রতিবেশী এমনকি আত্মীয়স্বজনও হিংসে করে। উচ্চারণে বা ইঙ্গিতে সকলে বারবার মনে করিয়ে দেয়, খুব ভাল আছি আমরা।

আসলে সত্যি নয়। কিন্তু সেটা বলি কাকে। আর বললেই বা বিশ্বাস করছে কে? আমাদের হয়তো অনেককিছু আছে। তবু বিস্তর ফাঁক। ফাঁক সম্পর্কে। ফাঁক ভালবাসায়। দাম্পত্যে, নিজেদের বোঝাপড়ায়। কিন্তু সে-সব বাইরে থেকে কে আর বুঝবে!

আমি চৌত্রিশ ছুঁই ছুঁই। স্বামী প্রীতম জাস্ট তিন বছরের সিনিয়র। এই বয়েসেই কল্যাণীতে আমাদের পেল্লাই তেতলা বাড়ি। ঘরে ঘরে এসি, যাবতীয় সুখের সরঞ্জাম। মারুতি সুইফটটা- চার বছর চালিয়ে বদলে নিলাম। এবার হন্ডা সিটি। কোনও দিকে অসুবিধে নেই। আধুনিক বাংলায় যাকে বলে বিন্দাস। যে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য, পর্যাপ্ত স্বাচ্ছল্য সহকারে অন্য উচ্চাঙ্গীরা পঞ্চাশে পা দিয়ে পাবার স্বপ্ন দেখে—আমরা দুজনে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেই সেটা ছুঁয়ে ফেলেছি। অথচ একটা নিদারুণ দুঃখবোধ, অসহায়তা, একাকিত্ব। প্রীতমের কথা জানি না। নিজের কথা বলতে পারি, এত সুখের মধ্যেও মন ভাল ছিল না।

আমার বিয়ে হয়েছিল একুশে। তখন ও মেডিসিন-এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করছে কলকাতায়। আমি সবে অনার্স পাস করেছি। ইংরেজিতে মাস্টার্স থেকে বে লাইন হয়ে স্রেফ সুন্দরী বলে সাত পাকে ফেঁসে গেলাম। মা-বাবার ভয় ছিল, তাদের টুকটুকে মেয়েটাকে নিয়ে কে কখন পালিয়ে যাবে।

বিয়ের পর কিছুদিন তো একটা ঘোরের মধ্যেই কেটে গেল। যেমন হয় আর কি! কদিনের ছুটি ম্যানেজ করল ও, দুজনে উধাও হয়ে গেলাম উটকামন্ড। জম্পেশ হনিমুন। ক'মাস পরে ফের বাপের বাড়ি। বাচ্চাটা জন্মাল আর প্রীতম এম ডি করে চাকরি নিল স্টেট মেডিকাল সার্ভিসে। কলকাতা থেকে মালদা-র ছোট্ট শহর। কালিয়াগঞ্জে ব্লক মেডিকাল অ্যান্ড হেলথ অফিসার। আমি ছোট্ট পাপুকে নিয়ে বাবা মায়ের কাছে ব্যারাকপুরেই থেকে গেলাম। ও যাওয়া-আসা করত। কষ্ট হত, তবু কোনও সপ্তাহেই বাদ দিত না।

প্রীতম দারুণ ম্যানেজ মাস্টার। বছর দেড়েক মফস্সলে কাটিয়েই কী করে যেন, বোধহয় স্ত্রী বা বাচ্চার অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে, কল্যাণীর গাঁধী মেমোরিয়ালে বদলি নিয়ে চলে এল। এবং এখানে এসেই জমে গেল প্রাইভেট প্র্যাকটিসে। হাতযশ ছিল দারুণ। শুরু হয়ে গেল দেদার রোজগার। ডাক্তার সান্যাল বলতে রোগীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকলাম আমরা। সাত আট বছরেই গাড়ি বাড়ি।

কল্যাণী স্টেশনের কাছেই এক বিখ্যাত পলিক্লিনিক-কাম-ওষুধের দোকানে প্রীতম বসে দুবেলা। হাসপাতালের ডিউটি সামলাত কী করে, আমি জানি না। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই। শুরুতে কিছুদিন একশ টাকা ফিস নিয়ে দেখে, ভিড় সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। কমাস পরেই দেড়শ। তাতেও ভিড় ঠেলা দায়। এবেলা ষাট আর দুপুরে হাসপাতাল ঠেকিয়ে বিকেলে মাত্র চল্লিশজন। একশ-র বেশি নাম লেখানো হত না। তাতেই রোজ রাত দশটা বেজে যেত। দিনে দিনে জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসেবে দুরদূরান্তে নাম ছড়িয়ে পড়তেই পেশেন্টের সংখ্যা সামাল দেওয়ার জন্য প্রীতম দক্ষিণা চড়িয়ে দিয়েছে দুশোতে। চাকরির মাইনে তো বাঁধা। এন পি এ নিত না। তবু মাসে লাখ লাখ টাকা রোজগার। আমি কালো টাকার বান্ডিল গুছিয়ে কূল পেতাম না। যেন চিটফান্ড কোম্পানির মালিক। এভাবে দামি মার্বেল দিয়ে বাড়িটাকে ঢেকে না ফেললে উপায় ছিল না। বেহিসেবের অত টাকা ব্যাংকে কি ঠাসা যায়?

প্রাচুর্য এল, কিন্তু বিয়ের পর দেখা প্রীতমের সেই ধুন্ধুমার ভালবাসা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ও তখন এক ভিন্ন নেশায় মেতে উঠেছে। ভালবাসার ফুলটা যে শুকিয়ে ঝরে যেতে বসেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। তখন শুধু রোজগার, আর রোজগার।

ব্যস্ততা ওর যত বাড়তে থাকল, ততই বেড়ে চলল এই বেচারির নিঃসঙ্গতা। বাচ্চাটাকে ছোটতে দেখভাল করতে হত ঠিকই, কিন্তু আড়াই বছর বয়েস থেকে পাপু অর্থাৎ আমাদের ঋতমবাবু কিন্ডার গার্ডেনে যেতে শুরু করার পর থেকেই আস্তে আস্তে একা থাকার যন্ত্রণাটা তীব্র এবং তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। দুপুরে একবার প্রীতম খেতে আসত বাড়িতে। কিন্তু তখন কথা বলবার প্রায় ফুরসৎই পেত না। নাকে মুখে দুটো গুঁজে দিত দৌড় আর রাতের বেলা চেম্বার সামলে ফিরে এগারোটা নাগাদ চান খাওয়ার পর এই ক্ষুধার্ত শরীরটার পাশে একতাল মাংসপিন্ডের মতো বিনা ভূমিকায় ঘুমিয়ে পড়ত। নিঃসাড়।

শেষ পর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে পাপুর ঘরে চলে গেলাম। ভেবে দেখেছিলাম, ক্লান্ত মানুষটাকে বিছানায় বিব্রত করা এক ধরনের অমানবিকতা।

পরিস্থিতিটা মেনে নিলাম বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রথমে একাকিত্ব এবং পরে ভীষণ একটা রাগ জমা হতে থাকল মনের ভিতর। বিয়ের সময় ভালবাসা কুঁড়ি থেকে হনিমুনের পর ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। সুবাস ছড়াল কয়েকটা বছর, ব্যস। তারপর কী করে যেন ঘোর বাস্তবতার চড়া রোদ্দুরে শুকিয়ে ঝড়ে গেল হঠাৎ। আমি থাকলাম, প্রীতমও আছে, আমাদের সন্তানও। কিন্তু সেই ভালবাসার ফুলটা নেই। সুগন্ধ হারিয়ে গেছে।

জীবন তো দীর্ঘায়ু এক বৃক্ষ, কেন সেখানে আর ফুল ফুটছে না ভালবাসার? আমার অযোগ্যতায়, নির্বুদ্ধিতায়, নাকি প্রীতমের উচ্চাশায়— বারবার কুঁড়িগুলো ঝড়ে যাচ্ছে। জীবনবৃক্ষের তাবৎ প্রাণরস শুষে নিচ্ছে যেন দূরের কোনও গ্রহ।

মাস্টার্স ডিগ্রি আমার না থাকা সত্ত্বেও সামান্য প্রস্তুতি ও

কথা ও কাহিনি - ৪

প্রশিক্ষণ নিয়ে নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যেই বসে পড়েছিলাম গতবারের আগের বার স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায়। প্রীতম তো হঠাৎ এমন চেষ্টা দেখে হেসেই খুন। মাস গেলে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার জন্য কোটিপতির গিন্নির এ যেন শখের কাঙালিপনা!

খুব খারাপ ছাত্রী বোধহয় ছিলাম না। এই পরীক্ষার্থিনীর বাহাদুরি নাকি যোগ্য প্রার্থীর অভাব অথবা সাবজেক্টটার ভীষণ চাহিদা ছিল বলেই বোধহয় বি এড ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও চাকরি জুটে গেল স্কুলে। প্যানেলে নাম ছিল ওপরের দিকেই। একটুর জন্যে কল্যাণীতে হল না বটে। কিন্তু কাঁচরাপাড়ার একটা এইচ এস স্কুলে পোস্টিং পেয়ে গেলাম অনায়াসে। কাউন্সেলিং-এর সময় পারিবারিক কারণে বাড়ির কাছাকাছি চাকরির প্রয়োজনটা কমিশনকে বোঝাতে পেরেছিলাম। এবং আমার র‍্যাঙ্কটা এ ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল।

এরপর শুরু হল অন্য সমস্যা। হোলটাইমার হিসেবে এক মাঝবয়েসি মহিলাকে পাপুর জন্য রাখা সত্ত্বেও বাচ্চাটার দেখভাল ঠিকঠাক হচ্ছিল না। পুরনো নিঃসঙ্গতার ক্ষতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীদের সাহচর্যে খানিক প্রলেপ পড়লেও, ছেলেটা অবহেলিত হচ্ছে বলে আমাদের দুজনেরই মনে হল। অতএব আলোচনা করে সহমত হয়েই ওকে পুরুলিয়ার নামী স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ানো হল। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে বাচ্চাটা বেশ আছে এখন। লেখাপড়ায় এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। মা-বাবাকে মিস করে ঠিকই, কিন্তু ওকেও তো মানুষ হতে হবে।

আমারও একটা নতুন জীবন। একথা বলার নয়, তবু জানাতে দ্বিধা বোধ করছি না, স্কুলে অভীক নামে ফিজিক্সের নতুন টিচারটির সংস্পর্শে আসার পর আমি ভিন্ন স্বাদের একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছি। নতুন কুঁড়ি গজিয়েছে জীবনে। একটা অন্য বর্ণগন্ধের ফুল অচিরেই ফুটবে বুঝি!

কেন এমন হল জানি না। চৌকশ ছেলেটি বয়েসে বছর দুয়েকের ছোটই আমার চেয়ে। নিজেই বলেছে। প্রথম কয়েকদিন সুমনাদি বলেই ডেকেছিল। অথচ একটা দুচ্ছেদ্য বাঁধনে আটকে গেছি দুজনে। এ বছরই ও এসেছে এস এস সি-র মাধ্যমে। ফিজিক্সে পি এইচ ডি। দারুণ দেখতে। লম্বা, ফর্সা। প্রাণবন্ত। এমন ফার্স্টক্লাস কেরিয়ার নিয়ে সি এস সি-তেও ইন্টারভিউ দিয়ে ফেলেছে। স্কুলে আটকে থাকার পাত্র নয়। এবং ওর এই উচ্চাশাটাই আমাকে বুকের মধ্যে কাঁপিয়ে তুলছে বারবার। অভীক যদি সত্যিই চলে যায়! এরপর আমার একাকিত্ব কাটাতে আবার কে হাত বাড়িয়ে দেবে? এমন বেপরোয়া কি হতে পারবে কেউ? ফুটি ফুটি অন্য রঙের ফুলটা পুরো পাপড়ি মেলার আগেই কি ঝরে যাবে?

কী আশ্চর্য! আমার হঠাৎ এমন সাজগোজের বাহার, উদাসী

অভীক যদি সত্যিই চলে যায়! এরপর আমার একাকিত্ব কাটাতে আবার কে হাত বাড়িয়ে দেবে? এমন বেপরোয়া কি হতে পারবে কেউ? ফুটি ফুটি অন্য রঙের ফুলটা পুরো পাপড়ি মেলার আগেই কি ঝরে যাবে?

আনমনা হাবভাব, রাতের বেলা বিছানায় কদাচিৎ ডাক পেলে স্রেফ যান্ত্রিকতা—কিছুই কি এই আইন মোতাবেক কর্তাটি লক্ষ করে না? টাকার পাহাড় গড়ার নিরন্তর প্রয়াস ছাড়া মানুষটার কিছু কি নেই? কোনও সুক্ষ্ম অনুভূতি? একটু তলিয়ে দেখার চোখ?

ভয় হত প্রথম প্রথম খুব, যদি প্রীতম আমার এই নিষিদ্ধ খেলাটা ধরে ফেলে? এখন একটাই শংকা—যদি অভীক পালায়! মাঝে সাঝে দ্বিধায় পড়তাম। এসব কি ঠিক হচ্ছে? আমি সন্তানের মা। বাচ্চাটাকেও কি ঠকানো হচ্ছে না?

ভালবাসার কাঙাল আমি। ভালবাসার খোঁজ আমার দারুণ নেশা। ঐশ্বর্য নয়, খ্যাতি না শুধু ভালবাসা। ভালবাসার ফুল ফুটলে তার সুগন্ধের টানে আমি হাজার মাইল হাঁটতে রাজি আছি।

কিন্তু অভীক কি আমাকে ভালবাসে? হ্যাঁ, আমাকে পছন্দ করে। মেলামেশা দ্বিধাহীন। সবই কি ওই বুদ্ধিমান ছেলেটির নিখুঁত অভিনয় কিংবা নিছক খেলাই? ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। রোমাঞ্চিত হয়েও আশঙ্কায় থাকি—যদি এই খেলা অবেলায় ভেঙে যায় কখনও!

চমকে দিল প্রীতম। কদিন ধরেই নানা অজুহাতে ও চেম্বারে যাচ্ছিল না। দৈনিক দশ-পনেরো হাজার হারাচ্ছে। একদিন দুপুরে হসপিটালের ডিউটি থেকে ফিরে হঠাৎ কী এক ছুটির জন্য আমাকে বাড়িতে দেখে বলল, সুমি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস আমি ছেড়ে দিচ্ছি। লাস্ট স্কেল রিভিশনের পর আমাদের নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাওয়েন্স অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওটা নিচ্ছি। গাধার মতো আর চেম্বারে খাটব না। কী দরকার, অনেক হল! হসপিটাল থেকে ফিরে ফ্যামিলির মধ্যেই কাটাব। পাপুকে বরং ফিরিয়ে এনে এখানেই ভর্তি করি। কেমন হয়?

আমি ভড়কে গেলাম, হঠাৎ! কেন?

প্রীতম হাসল, তুমি চাকরিটা নেবার পরেও দেখছি—খুব একা। কষ্ট হচ্ছে আমার। হ্যাঁ, এত বছর পর। সরি। আসলে টাকার ঘোরে টের পাইনি। অন্যায় করেছি। যদি তোমার ইচ্ছে করে, স্কুলে যেও। আমি আটকাব না। আর পাপু ফিরে আসার পর যদি এই গোলামি ভাল না লাগে ছেড়ে দিও। অনেক টাকা জমে গেছে, টোটাল অ্যামাউন্টটা বিচ্ছিরি রকমের— আর দরকার নেই। কোথাও তো থামতে হয়, না হলে মুখ থুবড়ে পড়ব কোনও দিন। আমি নিজের ব্যাপারে ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। তুমি ভেবে দেখ, জোরাজুরি নেই।

বুকের মধ্যেটা আমার কেমন শিরশির করে উঠল। পরের দিন স্কুলে গিয়ে যখন শুনলাম—অভীক একটা পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে মারে স্টেট ইউনিভার্সিটিতে চলে যাচ্ছে আমেরিকায়, একটুও কষ্ট হল না।

অচেনা ফুলটা ঝরে গিয়ে আমাদের জীবনে পুরনো ফুল আবার ফুটে উঠছে রঙিন পাপড়ি মেলে। ম-ম করছে তার সুগন্ধ।

একটা গাছ

জয়নাল আবেদিন

একটা সুর
অনেক দুঃখকে সরিয়ে রাখে
নেশা কেটে গেলে
কেবলই মনে পড়ে মাকে।

একটা চাওয়া
বাড়িয়ে দেয় আরো চাওয়া
ভুল ভেঙে গেলে
ফুরোয় আসা আর যাওয়া।

একটা আলো
বিছিয়ে দেয় পথের ধুলো
একলা যখন
কাছে ডাকে গোলাপ ফুলও।

একটা ভোর
অসংখ্য ভোর তুলে আনে
কত কথা
রোদ, ছুঁয়ে রোদ, ছুঁয়ে টানে।

একটা গাছ
ছড়িয়ে রাখে অনেক ডালপালা
একটা খিদে
তার পাশে অসংখ্য সব থালা।

দেহাতীত

অনিশা দত্ত

উত্তর-পঞ্চাশ—বার্ধক্যে আগুয়ান,
ঝরল কি যৌবনের মুকুল?
তবে কেন ছাপিয়ে দুকূল
আবেগের জোয়ার, মন আনচান।
উচ্ছ্বাসে উৎসুক নারীর
উৎফুল্ল উন্মুখ শরীর,
বিহ্বল আমাকে, জানায় আহ্বান
সংসার শিকলে আটকা,
নিষেধের চাবুকের ঝটকা,
বন্দী বান্দার মৃত ন্যায় প্রাণ!
ভালবাসা কাঁদে-কাঁপে,
কামনার তাপে-ভাপে,
দেহাতীত প্রেম! দূর আসমান
তাই, কাছে পেতে চাই!

আবহমান

তিস্তা

অবজেকটিভ থেকে ইন ডিটেলস
ইন্টার পার্সোনাল বলে তবে আর কিছু রইল না!
তীব্র খিদেতে অন্ধ কাল পেট না, জ্বলে যায় গা...

চুম্বনের সঙ্গীতে চুরমার সিন্ধুর সভ্যতা!
চেতক, তুমি কি জানতে পেরেছিলে—
কোন কোন স্ফুলিঙ্গ তাকে টেনে নিয়ে গেছিল ভিন রাজ্যের দিকে!
জানতে পেরেছিলে মেরুর দন্ড-হীন মুগ্ধ বোধের কথা?
ওই দ্যাখো, অলীক মৈথুন সেরে উঠে এল রাত
রাতের গর্ভ ফেটে এখুনি সূর্যের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়বে—
আরো এক কর্ণ-কুন্তি সংবাদ।

অক্টোবর মাস অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীগুপ্ত (অনাদি)

মেষ রাশি
রাগ জেদ বৃদ্ধি পেতে পারে। স্বাস্থ্যঘটিত কারণের জন্য মানসিক চাপ থাকবে। তবে আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ। দূর ভ্রমণে শুভ। সন্তান লাভেও শুভ। শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : বুধ ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাদ্য : আনারস ; অশুভ খাদ্য : আতা।

মিথুন রাশি
প্রণয় সূত্রে বিবাহ হবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ সাফল্য আসবে। চলা-ফেরা এবং বেহিসেবের খাওয়া থেকে ক্ষতি হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৬ ; অশুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : বুধ ; শুভ খাদ্য : দালিয়া ; অশুভ খাদ্য : মুসুর ডাল।

সিংহ রাশি
নতুনভাবে অর্থলগ্নী করলে ক্ষতি হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার ফল ভাল হবে। সন্তান হওয়াতেও শুভ। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : ধূসর ; অশুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাদ্য : মাছ ; অশুভ খাদ্য : সামুদ্রিক মাছ।

বৃষ রাশি
একাগ্রতার অভাবে শিক্ষার ফল খারাপ হবে। ব্যবসায় অর্থলগ্নী করলে ভাল ফল পাবেন। স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। হঠাৎ বিবাহের যোগ আছে। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : সাদা ; অশুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : সোম ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাদ্য : পেঁপে, সয়াবিন ; অশুভ খাদ্য : মটরশুটি, টমেটো।

কর্কট রাশি
হঠাৎ বিপদের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, বিয়ে স্থির হয়েও ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জন্মস্থানের বাইরে কর্মজীবনে উন্নতি লাভ হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ১ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : মঙ্গল ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাদ্য : পোস্ত ; অশুভ খাদ্য : গাজর।

কন্যা রাশি
নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। হঠাৎ অর্থলাভ হতে পারে। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে ভাল সময়। দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে অশুভ কারণ আক্সিডেন্টের সম্ভাবনা প্রবল। শুভ সংখ্যা : ৪ ; অশুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : নীল ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাদ্য : মুরগির মাংস, ছোট মাছ ; অশুভ খাদ্য : মাছের তেল।

তুলা রাশি
জল ও জলপথে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বিয়ে ভাঙার যোগ আছে। বাধা থাকলেও কর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাদ্য : আটা, ছোলার ডাল, ; অশুভ খাদ্য : ময়দা, সুজি।

ধনু রাশি
যানবাহন ক্রয় করার জন্য উপযুক্ত সময়। বিবাহ ক্ষেত্রে শুভ। শিক্ষা ক্ষেত্রে অশুভ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : লাল ; অশুভ রঙ : আকাশি ; শুভ বার : মঙ্গল ; অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাদ্য : থোর, মোচা : ডুমুর ; অশুভ খাদ্য : তেঁতুল, ডিম।

কুম্ভ রাশি
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজে যুক্ত যাঁরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। বাইরে যাওয়ার সুযোগ আসবে। পারিবারিক চাপ থাকবে। সন্তান স্থান অশুভ। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : বেগুনি ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাদ্য : মুসুর ডাল ; অশুভ খাদ্য : সরষে।

বৃশ্চিক রাশি
বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পকর্মে বিলম্ব এবং বাধার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি। শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৬ ; শুভ রঙ : মেরুন ; অশুভ রঙ : কমলা ; শুভ বার : রবি ; অশুভ বার : শনি ; শুভ খাদ্য : ছোট মাছের মাথা, ঘুগনি ; অশুভ খাদ্য : বড় মাছের মাথা ও ল্যাজা।

মকর রাশি
আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। আয় হলেও ব্যয়ও হবে। গৃহে অতিথি সমাগমের সম্ভাবনা আছে। শুভ সংখ্যা : ৮ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : ঘিয়ে ; অশুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : রবি ; শুভ খাদ্য : নিরামিষ ; অশুভ খাদ্য : আমিষ।

মীন রাশি
আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ হবে। তবে মানসিক টেনশন থাকবে। শরীরের দিকে সতর্ক থাকতে হবে। সন্তান লাভের সম্ভাবনা শুভ। শুভ সংখ্যা : ৪ ; অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : কালো ; অশুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : সোম ; অশুভ বার : বুধ ; শুভ খাদ্য : রুটি, লুচি, সুজি, সবজি ; অশুভ খাদ্য : চালের জিনিস, ছোলা।

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।